গারিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ

শিবশঙ্কর মিত্র

সমবায় পাবলিশার্স
৩৩।২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সমবায় পাবলিশার্স: ৩৩-২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ

প্রথম সংস্করণ—১৯৪২

মূল্য দুই টাকা চারি আনা

পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস: ৪৭, মধু রায় লেন, কলিকাতা
যামিনীমোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

পরিচয়

গড়পার রোডে আমার যাতায়াত ছিল। একটি স্বল্প পরিচিত স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির যুবক ঘটনাচক্রে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমায় আসিয়া পড়িলেন। একে দীর্ঘ-কালের রাজবন্দী, তার উপর কমিউনিস্ট এবং সেই সঙ্গে চরিত্রের গাম্ভীর্য্য—এমন লোকের সঙ্গে রাজনীতি ছাড়া আর কিসেরই বা আলাপ হইতে পারে? সুতরাং নূতন পরিচয়ের ভদ্রজনোচিত সীমা রক্ষা করিয়া বৈঠকী আলাপে যোগ দিলাম।

ইউরোপে তখন যুদ্ধ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণীর ব্লিজক্রিগ আক্রমণে অতি দ্রুত পশ্চিম রণাঙ্গনে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। এই নূতন নাৎসী যুদ্ধের বিস্ময়কর তাণ্ডবে সারা পৃথিবীতে তোলপাড়। কিন্তু কেন এই যুদ্ধ। ইহার গতি কি, প্রকৃতিই বা কি, নূতনতর রণধর্ম্ম ও রণকৌশল কি ভাবে দেখা দিল; ইহার গতিপথে ফ্রান্সের মত অমিত বলশালী রাষ্ট্র চকিতে চূর্ণ হইয়া গেল কিরূপে?—এই প্রশ্নগুলি আমার মস্তিস্ক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। আগেই সঙ্কল্প করিয়া-ছিলাম এই যুদ্ধ বুঝিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। 'যুগান্তর' লইয়া আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আধুনিক যুদ্ধের সর্ব্বগ্রাসী রূপ পাঠক সমাজের কাছে তুলিয়া ধরিতে হইবে,

দেশের সর্ব্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে যুবকদিগকে এই নূতন-তর রণধর্ম্মের দীক্ষা দিতে হইবে—এমন একটা উন্মাদনাময় স্বপ্ন আমাকে পাইয়া বসিল। যেখানে যত পুস্তক, স্বদেশী ও বিদেশী যত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাওয়া যায় সমস্তই খুঁজিতে লাগিলাম।

তারিখটা মনে নাই। সকালবেলা গড়পার রোড সূর্য্যালোকে দীপ্তিমান। যুবকটির সঙ্গে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় ডুবিয়া গেলাম। হঠাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘরের কোণের জীর্ণ তোরঙ্গ ও ময়লা বাক্স হইতে কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিলেন। একটা ভারী ফাইল এবং সংবাদপত্রের প্রচুর কাটিং আমার হাতের কাছে ফেলিয়া দিলেন। দেখিলাম, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংঘর্ষ কাহিনী—ওয়াজিরস্থানের লড়াইয়ের বহু তথ্যপূর্ণ প্রকাণ্ড ফাইল এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা টেকনিক্যাল পুস্তক ও প্রবন্ধ! তারপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ, ইংরাজীতে লেখা যুদ্ধের বিবর্ত্তন সম্পর্কে—বহু তথ্যে প্রবন্ধটি মূল্যবান। আমার আগ্রহ দেখিয়া যুবকটি একে একে তাঁহার বইগুলি আনিলেন। Infantry Training (যাহা খাস বৃটিশ সমর দপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত) হইতে সুরু করিয়া শিশুদের জন্য রচিত সামরিক গ্রন্থ পর্য্যন্ত! এতটা প্রত্যাশা করি নাই। সুতরাং বিস্মিত হইলাম।

সমরবিজ্ঞানের অসাধারণ ভক্ত এই যুবক, ইঁহারই নাম শিবশঙ্কর মিত্র। তাঁহাকে আহ্বান করিলাম 'যুগান্তরের'

সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদানের জন্য। আমার নিজের যুদ্ধবাতিকতার সঙ্গে শিবশঙ্কর মিত্রের সাহায্য ও অধ্যয়ন এবং পরিশ্রম যুক্ত হইল। আধুনিক সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধকে বুঝিবার জন্য আমাদের আর চেষ্টার ত্রুটি রহিল না।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত গরিলা যুদ্ধ (বিদেশী উচ্চারণ-বিশারদদিগের মতে 'গেরিলা') সংক্রান্ত তাঁহার বিশেষ প্রবন্ধগুলি এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সমস্ত নূতন চেষ্টাকেই যেমন প্রথম লঘু করিয়া দেখা হয়, এই ব্যাপারেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অজ্ঞ এবং অতি-বুদ্ধিমানদের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়া আমি হাল ধরিয়া ছিলাম। কারণ, আমি জানিতাম এই যুদ্ধ এমন সর্ব্বব্যাপক যে, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ইহা নর-নারীর চিত্ত আলোড়িত করিবে। ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে শত্রু যখন হানা দিবে, তখন বুঝা যাইবে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির মূল্য কি। আজ জাপান আসামের সীমায় দণ্ডায়মান এবং জার্ম্মাণী সুয়েজখালের অদূরে। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ মুঞ্জে, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ গরিলা যুদ্ধের আবশ্যকতা লইয়া বহু বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে বাঙ্গলায় ও আসামে গরিলা যুদ্ধের উপযোগিতার উপর পর্য্যন্ত জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অনেক আগে শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর মিত্র 'যুগান্তরের' মারফৎ গরিলা যুদ্ধের বিস্তৃত আলোচনা ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে

লিখিয়াছিলেন এবং লিখিতেছিলেন। রণবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভৌগোলিক সংস্থান এবং সামাজিক বিবর্ত্তন ইত্যাদি বহুদিক ধরিয়া গরিলা যুদ্ধের বিস্তৃত তথ্য আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত খাঁটি সামরিক সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই। এই পুস্তকটি সেই অভাব মিটাইবার প্রথম সোপান স্বরূপ। গরিলা যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে লেখকের নিপুণ বিশ্লেষণ এবং পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করা আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। কারণ, 'যুগান্তরে' এইগুলির প্রকাশ সম্পর্কে আমি নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ গরিলা যুদ্ধের আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে এই আন্দোলন বিস্তারে এবং রণধর্ম্মের প্রচারে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, শিবশঙ্কর মিত্র নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার এই সদ্য প্রকাশিত পুস্তক বাঙ্গলা দেশের যুবকদিগকে ঘরের ও বাহিরের শত্রু দমনে সহায়তা করুক—এই প্রার্থনা লইয়া আমি কৃতী লেখককে আমার আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন জানাইতেছি। ইতি,

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

'যুগান্তর' কার্য্যালয়
কলিকাতা
১৪ই জুলাই, ১৯৪২

পরস্বলোভী দস্যুর অত্যাচার-আক্রমণের
বিরুদ্ধে
বিশ্বের মুক্তি-সংগ্রামে আত্মাহুতি দানে
অগ্রবর্তী
স্বাধীনতাকামী বাঙলার
সৈনিক-প্রাণ ভাই-বোনেদের হাতে
—অর্পিত হইল

নিবেদন

পৃথিবীতে যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, পররাজ্যলোভী নাৎসী-ফ্যাসিস্তের ক্ষিপ্ত আক্রমণে সমস্ত জাতি ও দেশের বুকে এক-একটি মুহূর্ত যে দ্রুত বিপর্যয় বহন করিয়া আনিতেছে—তাহাতে আমাদেরও যাহা কিছু করিবার আছে তাহাও দ্রুত করিতে হইবে। মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার যে গুরু-দায়িত্ব ও আশু কর্তব্য রহিয়াছে—সেই সম্বন্ধে আপাত-কার্যকরী বিষয়গুলি যে ভাবে পারিয়াছি—যেখানে যতটুকু তথ্য যোগাড় করিতে পারিয়াছি,—সেই অনুযায়ী আলোচনা করিয়াছি এবং নিজের অভিজ্ঞতা, বিচার ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক সমস্যার সম্মুখে সম্ভবপর সমাধানের নির্দেশ দিয়াছি। আশা করি ও ভরসা রাখি, ইহাতে যে দোষত্রুটি চোখে পড়িবে, বাঙলার কর্মী-যোদ্ধাগণ আবশ্যক মতো তাহার সংশোধন ও পরিপূরণ করিয়া লইবেন। বাঙলার জিলায় জিলায় সুসংবদ্ধ ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া উঠিয়া অবিলম্বে গরিলা যুদ্ধের দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করুক—এই আশা ও আকাঙ্খায় এই গ্রন্থখানি রচিত হইল। বাঙলার ভাই-বোনের এই ব্রত পালনে যদি এই পুস্তকখানি এতটুকুও সাহায্য করে তবেই নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করিব।

পুস্তকখানি রচনায় সর্বাপেক্ষা ঋণী রহিয়াছি—'যুগান্তর' সম্পাদকের নিকট। সে ঋণ এত বেশী যে তাহা পরিমাপ করিতে সঙ্কোচ অনুভব করি। 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্তৃপক্ষও পুস্তকের অধিকাংশ ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে অশেষ ঋণী করিয়াছেন।

প্রকাশকের নিকট গ্রন্থকাররা যে ঋণী থাকিবেন তাহা স্বাভাবিক। তবে এই পুস্তকের গঠনে, ভাষায় ও তথ্য-সংযোজনে প্রকাশক যে উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই সুদুর্লভ।

কলিকাতা

—শিবশঙ্কর মিত্র

২৫।৭।৪২

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গরিলা যুদ্ধ

দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ

গরিলা শিক্ষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গরিলাদলের সমস্যা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বর্তমান যুদ্ধে গরিলার কীর্তি

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

গরিলা যুদ্ধ

(১)

ইতিহাসের গতিপথে যুদ্ধ

মানুষ অনাদিকাল হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু সমাজ বিবর্তনের প্রথম স্তরে সে যে-যুদ্ধ করিত তাহাই সর্বযুগকাম্য যুদ্ধ। সে যুদ্ধ ছিল মানুষে মানুষে নয়, জাতিতে জাতিতে নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, তাহা ছিল মানুষ ও প্রকৃতির ধ্বংসকারী শক্তির সহিত। সে যুদ্ধের ফলে জয়ী হইয়া যে-শিকারকে মানুষ ঘরে আনিত তাহা নিজেদের ছোট সমাজের অংশীদারদের মধ্যে তাহারা সমভাগে বণ্টন করিয়া লইত। এই সমভাগে বণ্টন করিবার নীতি তাহারা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছিল; জ্ঞানতঃ তাহারা ইহাকে গ্রহণ করে নাই। ফলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সেই সাথে সেই ব্যক্তির সম্পত্তিকে বৃদ্ধি করিবার স্পৃহা দেখা দিল; তাহারা আর সমবণ্টনের নীতিকে বজায় রাখিতে পারিল না। যুদ্ধ নূতন রূপ গ্রহণ করিল। মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল; গত সমাজে যাহারা স্বাভাবিকভাবে দলপতি হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা ক্রমে প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তির

লোভে পরস্পরে দ্বন্দ্বে নামিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ শুরু হইল।

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের তেমনি যুগে শিকারজীবী মানুষের সঙ্ঘ ক্রমে কৃষিজীবী মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। নূতন সমাজব্যবস্থার অর্থ নৈতিক কাঠামোর আদল বদলাইয়া গেল। বন্য শিকার ছাড়িয়া কৃষি-কার্যে মনোনিবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজা আসিল, জমিদার আসিল, রাজা আসিল। জমিদার জমিদারকে না মারিলে রাজা হইতে পারে না, রাজা রাজাকে না মারিলে সম্রাট হইতে পারে না, অতএব যুদ্ধ বাধিল। প্রথম প্রথম রাজার সহিত রাজার, জমিদারের সহিত জমিদারের ব্যক্তিগত যুদ্ধটাই ছিল প্রধান। ধীরে ধীরে তাহাদের মনে হইল, যুদ্ধে সুধু তাহারাই বীরত্ব দেখাইয়া মরে কেন ! ফলে বেতনভোগী সেনাপতি আসিল, ভাড়াটিয়া সৈন্যদল আসিল। যুদ্ধ বাধে রাজায় রাজায় স্বার্থের সংঘাতে, মরিতে মরে নলখাগড়ার দল। প্রজারা ভাবে উপায় নাই, নহিলে রাজরোষে পড়িবে। কিন্তু পরের স্বার্থে যোদ্ধারা কখনও আপ্রাণে যুদ্ধ করিতে পারে না। অতএব ধর্মের দোহাইমানা হইল, আসিল ধর্মযুদ্ধ। পুরোহিতের ডাক পড়িল। প্রচার চলিল, ধর্মই নাকি যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে। যুদ্ধ করিয়া অপর ধর্মকে না মারিলে নাকি হিন্দু ধর্ম থাকিবে না, খৃষ্ট ধর্ম রসাতলে যাইবে, ইস্‌লাম ধর্ম জাহান্নমে যাইবে !

ইতিহাসের গতিপথে যুদ্ধ

ইহার পর সভ্যতার গতিপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব ও প্রসারের ফলে সমাজব্যবস্থায় আবার একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইল। প্রতি দেশেই ব্যবসা ও বাণিজ্যের ভিতর দিয়া জমিদার ভিন্ন অন্য একদল লোক ক্রমে ধনপতি হইয়া উঠিতে লাগিল। এই পুঁজি-ধনের সুযোগে ও অধিকতর মুনাফার লোভে মানুষের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি তৈরি করার এক নূতন প্রচেষ্টা বণিক-ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে আরম্ভ হইল। এমনি সময়ে আসিল যুগান্তকারী বাষ্পীয় যন্ত্র। ইহার সাহায্যে অপরিমিত মুনাফার দ্বার খুলিয়া গেল। জমিদার দেখিল, তাহার একচেটিয়া মালিকানা হাতছাড়া হইয়া যায়; আর ব্যবসায়ীরা দেখিল, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিজেদের দখলে না আনিলে রাজারা তাহাদের ধনপতি হইতে দিবে না। সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধিল; ফরাসী বিপ্লবে আমরা তাহার জ্বলন্ত রূপ দেখি। সিংহাসনে রাজা অধিষ্ঠিত থাকিলে কী হইবে, রাজা ও জমিদার যে সমাজব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ছিল, সে সমাজ আর নাই। ফলে গণতন্ত্রের মুখোসে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু নূতন রূপে আবার সেই একই সমস্যা উঠিল, ধনী আরেক ধনীকে না মারিলে সে তাহার ধন-কুম্ভ পূরণ করিতে পারে না। তাই যুদ্ধ পূর্বের মতো সমান ভাবেই চলিতে লাগিল। উদ্দেশ্য রহিল, এক ধনিকদল অপর ধনিকদলকে তাড়াইতে চায়, কিন্তু তাহার জন্য মরিবে কে? না, সেই ধনিকদের কৃতদাসে পরিণত

জনসাধারণকেই এক নূতন অস্ত্র ও বর্ম ধারণ করিয়া মরিতে হইবে! পরের স্বার্থে যোদ্ধারা কখনও আপ্রাণে যুদ্ধ করিতে পারে না। অতএব নূতন দোহাইমানার আবশ্যক হইল, এবার আসিল জাতীয়তা। 'ভগবান পুত্র' নরপতিকে ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সমান অধিকারের মুখোসপরা ধনতন্ত্রকে ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া শোভা পায় না। সুতরাং জাতিকে বাঁচাইবার ছুতায় অপর জাতির ধনিকদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলিল। জাতির নামে মুষ্টিমেয় ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতে মরণযুদ্ধ দেখা দিল। এবার আর পুরোহিত নয়; এবার নিখুঁত ও সুষ্ঠু প্রচার বিভাগ, দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক সংবাদপত্র, হাজার হাজার স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠান, লক্ষ লক্ষ পুস্তক। সবাই বুঝিল, হাঁ, জাতিকে বাঁচাইতেছি! একবারও শ্রমিক কৃষকের দল, জনসাধারণ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না যে, সুধুমাত্র তাহাদেরই শোষক শ্রেণীর মুনাফার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা নিজেদেরই হাতে গড়া কামানের মুখে পরস্পরের প্রাণ লইয়া ভাবিল, আমি মরিলে কী হইবে, আমার পুত্র-পরিবারবর্গকে বর্বর শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইয়া গেলাম। দেখা দিল ফ্রাঙ্কো-জার্মাণ যুদ্ধ, ক্রিমিয়ান যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, বুয়োর যুদ্ধ, আর অবশেষে পৃথিবীব্যাপী গত মহাযুদ্ধ।

ইতিহাসের গতিপথে যুদ্ধ

মুনাফার লোভে যখন পুঁজিবাদীরা জগতের বাজার লইয়া এমনিভাবে কাড়াকাড়ি করিতেছিল, নিজেদের কলে ও কারখানায় প্রস্তুত মাল বিক্রীর লোভে রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য বর্বরোচিত যুদ্ধে মত্ত ছিল, তখন একদিন মানব ইতিহাসের এক সুপ্রভাতে নূতন আলোর সন্ধান মিলিল। সমাজ বিবর্তনের আপন নিয়মে রুশের প্রান্তরে ঘর্মসিক্ত শ্রমিকের তাজা রক্তে নূতন এক সভ্যতার ইতিহাস লিখিত হইল। মুষ্টিমেয় ধনি অগণিত জনসাধারণকে চিরদিনই শোষণ করিয়া তাহার মুনাফা বাড়াইয়া চলিবে—ইহা হইতে পারে না। শ্রমিকেরা যে-কারখানায় কাজ করে, সে কারখানা হইবে তাহাদেরই; কৃষকেরা যে-জমিতে চাষ করে, সে জমি হইবে তাহাদেরই। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবে এই দাবি মূর্ত হইয়া উঠিল। নূতন সভ্যতা, নূতন সমাজ, নূতন নীতি গড়িয়া উঠিল।

ধনিকেরা প্রমাদ গণিল। তাহারা এতদিন পরস্পরে দ্বন্দ্ব করিয়া মুনাফার মাত্রা বাড়াইবার চেষ্টায় মত্ত ছিল। দ্বন্দ্ব ছিল জাপানী ধনিকদলের সাথে জার্মাণ ধনিকদলের, জার্মাণ ধনিকদলের সাথে ফরাসী ধনিকদলের, ফরাসী ধনিকদলের সাথে ইংরাজ ধনিকদলের, ইংরাজ ধনিকদলের সাথে মার্কিন ধনিকদলের। কিন্তু এখন এক নূতন সমস্যা দেখা দিল, ইহাদের সকলের এক সাধারণ শত্রু জন্ম লইল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আজ দুনিয়ার

গোটা ধনিকতন্ত্রের মূলে আঘাত করিয়াছে। ধনিকরা ভাবিল, আজ হউক, কাল হউক, মানব কল্যাণের এই আদর্শ সংক্রামক ব্যাধির মতো সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। ধনিকের মুনাফা লাভের ব্যবস্থাকে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিত ধ্বংস করিবে। অতএব তাহাকে যেভাবে পারো সেই ভাবেই সকলে মিলিয়া মারো। কিন্তু মারো বলিলেই মারা চলে না; বিভিন্ন দেশের ধনিক গোষ্ঠির মাঝে অন্তর-কলহকে ধামা চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। সে অন্তর-কলহকে অস্বীকার করিলে আবার ধনতন্ত্রের বাঁচিয়া থাকা প্রায় বৃথাই হইয়া পড়ে। কারণ মুনাফাই তাহাদের লক্ষ্য এবং একে অন্যকে দুনিয়ার বাজার হইতে না তাড়াইতে পারিলে মুনাফার অঙ্কে শূন্য দেখা দিবে। মানব সমাজের অগ্রগতিতে আজ এই দুইটি দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; একদিকে ধনিকদলের ছোট ছোট গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে দ্বন্দ্ব, এবং অন্যদিকে গোটা ধনিক-দলের বিরুদ্ধে নব জাগ্রত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট শক্তির দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান যুদ্ধগুলি এই দুইটি দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়াই রূপ লইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্ব প্রথম দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি মধ্য ইয়োরোপে জার্মাণ সামরিক শক্তিকে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কণ্টক দিয়া কণ্টক অপসারণ। ধনতন্ত্রের সাধারণ শত্রু

সোভিয়েটকে জার্মাণীর নাৎসী শক্তি দিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট কর্ণধার ষ্ট্যালিনের কূটনীতিতে সে যুদ্ধ ১৯৩৯-৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট সীমান্ত হইতে অনেক দূরেই সংযত ছিল। ১৯৩৯-৪১ সালের যুদ্ধে সারা ইয়োরোপ বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত নাৎসী-রাষ্ট্রে তখনও শেষ বোঝাপড়া হয় নাই। এদিকে ইয়োরোপের অন্যান্য শক্তি পদদলিত হইলে যেমন নাৎসী ও সোভিয়েট শক্তির দ্বন্দ্ব মুখোমুখী হইয়া দেখা দিল, তেমনি এই দেড় বৎসর জার্মাণী অন্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকাতে সোভিয়েট ইত্যবসরে কূটনীতিতে ও সমরোপকরণে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। জার্মাণীর পক্ষে আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়। বিশ্বাসঘাতকতার চরম ও নগ্নরূপ দেখাইয়া সে রুশো-জার্মাণ চুক্তিকে অবহেলাভরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সোভিয়েটকে আক্রমণ করিল এবং সেই সাথে সাথে তুনিয়ার অন্যান্য ধনতান্ত্রিক শক্তিকে আবেদন জানাইল,—তোমাদের সকলের সাধারণ শত্রু সমাজতান্ত্রিক দেশকে আক্রমণ করিয়াছি, অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য করো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব উপরোক্ত দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের রূপ নিয়া দেখা দিল। আজ তাই নীপার নদীর বাঁকে বাঁকে সমাজতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের বোঝাপড়া হইতে চলিয়াছে।

ঘুণে-ধরা ধনতন্ত্র ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নির্মম

নাৎসী ষড়যন্ত্র দেখা দিয়াছে। এই নাৎসী ষড়যন্ত্র জনসাধারণকে শোষণে নিঃস্ব করিবার জন্য পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের আবেদন জানাইলে কী হইবে! সোভিয়েট সভ্যতার নূতন মানব কল্যাণ-প্রসূ ব্যবস্থার প্রতি পৃথিবীর জনসাধারণের মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ধনতন্ত্রের অন্তর-কলহে ভীত পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণের এই মমতাকে অবহেলা করিবার সাহস হারাইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে আজ ইহাকে অবহেলা করিতে গেলে আজ হউক কাল হউক নিদারুণ বিপ্লব দেখা দিবে। তাহারা বুঝিয়াছে, যে সভ্যতা, যে ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণ তাহার মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে, তাহাকে সে কিছুতেই নিজের হাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইবে না। সেই জন্যই আজ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শেষ বোঝাপড়ার মরণ-ঘাতী-দ্বন্দ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সোভিয়েট দেশের মিলন সম্ভব হইল।

আমরা ভারতবাসীরা এই বিশালতম রণাঙ্গণের খেলা প্রায় নিরপেক্ষ ভাবেই দেখিতেছিলাম। নির্বোধের মতো ভাবিতে-ছিলাম, এই যুগান্তকারী নির্মম যুদ্ধের আঁচড় হইতে আমরা রেহাই পাইলেও পাইতে পারি। আমরা বুঝিতে না চাহিলে কী হইবে, নাৎসী-বন্ধু জাপান আজ বোমার আঘাতে আমাদের জানাইয়াছে—ভারতবাসি, তোমার পথ বাছিয়া লও। দুইশত বৎসরের শোষণে জর্জরিত ভারতবাসীর পথ বাছিয়া লইতে

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় নাই। হাজার প্রান্তে হাজার কণ্ঠে সে আজ জানাইয়াছে—পরমশত্রু জাপানকে আমরা রুখিব। এই যুদ্ধ আমারই যুদ্ধ। এই যুদ্ধই আমার মুক্তি আনিবে। কারণ সে জানে, আজ নীপার নদীর বাঁকে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রে যে শেষ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, ভারতের পূর্বদ্বারের এই যুদ্ধ তাহারই অন্যতম অঙ্গ। এই যুদ্ধে আমরা হাত মিলাইব, ইহা সুনিশ্চিত। —কিন্তু পথ ?

সেই পথেরই সন্ধানে গরিলা যুদ্ধের এই আলোচনা। যান্ত্রিক যুগের চরম পরিণতিতে যুদ্ধ কী নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং ধনতন্ত্রের আপন অপরিহার্য ব্যবস্থায় আজ যুদ্ধের উপর জাগ্রত জনগণের কী নিদারুণ আধিপত্য আসিয়াছে --এই ঘটনারই আলোকে বাঙলার মাটিতে জনযুদ্ধের আহ্বানে কী দুর্ধর্ষ গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করা সম্ভব, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহারই সন্ধান দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

(২)

যুদ্ধ ও জনগণ

"Malayaians do not appear seriously to have resisted invasion in their homeland. To some extent the same phenomena are noticeable in Burma. It may be too late to take action in Burma to join the local population with us in fighting against the Japanese. In India however there is still time".

—Hore Belisha.

আজ দেশ বিদেশের কাগজে প্রচারিত হইতেছে যে বর্তমান সর্বব্যাপক যুদ্ধ জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে চালানো সম্ভবপর নহে। জনসাধারণকে একদিন যাঁহারা অবজ্ঞায় আমলই দিতেন না, তাঁহারাই আজ যুদ্ধের ভয়াবহ রূপকে উপলব্ধি করিয়া সেই মূর্খ, অজ্ঞ, বর্বর ও ভেড়ার দল বলিয়া পরিচিত জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। কিসের চাপে পড়িয়া, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার পট পরিবর্তনে এই অঘটন ঘটিল, তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এমন একদিন গিয়াছে যখন যুদ্ধটা ছিল রাজায় রাজায় বা সৈন্যে সৈন্যে। অবসর সময়ে রাজা বা রাষ্ট্র প্রচুর খাদ্য ও প্রচুর গোলাবারুদ রসদ গৃহে জমা করিয়া রাখিত। তারপর যখন যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিত সেনাপতিরা সুবিধামতো স্থানে ঘাঁটি

বাঁধিয়া সৈন্য ও রসদ উপস্থিত করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন হইয়া গেলে স্থানীয় অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত। শক্তি পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সাধারণের পক্ষে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকাই স্বাভাবিক; যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার যেমন তেমন। এ যেন খেলার মাঠে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই নিয়মে যখন রাজায় রাজায় বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন একদিন সমাজ পরিবর্ত্তনের আপন নিয়মে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ দেখা দিল। সমাজ তখন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কলকব্জার আবিষ্কারে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলগাড়ী, মোটর, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির আগমনে রাষ্ট্রের ও সৈন্যের সংগঠনকে বিশাল ও ব্যাপক করা সম্ভব হইয়াছে। প্রচুর অস্ত্র ও প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিবার সুবিধা থাকায় রণক্ষেত্র সমুদ্র হইতে সমুদ্র বা পর্বত হইতে পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া সরাইতে বা ভাঙিতে পারে না। দুই দলই প্রচুর অস্ত্র ও সৈন্য আমদানি করিবার শক্তি রাখে। যুদ্ধে অচল অবস্থা আসিল এবং ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইল। কিন্তু এমন অবস্থায় কোটি কোটি সৈন্যকে সক্ষম রাখিবার জন্য অনবরত রসদ ও আহার যোগাইতে হইবে। ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় শ্রমিক ও কৃষককে ক্রমেই বেশি পরিশ্রম করিয়া অধিক ফসল ও অধিক রাইফেল তৈরি করিতে থাকিতে

হইবে। তাহা না হইলে যুদ্ধ চলে না। গুদামে মজুত গোলা বা রুটি আর যথেষ্ট নহে।

(১) এই অবস্থাই প্রথম জনসাধারণ ও সৈন্যের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিল। কৃষক ও শ্রমিক যদি কোনো কারণে প্রচুর খাদ্য ও অস্ত্র নির্মাণ না করে তবে সৈন্য খালি পেটে ও শূন্য বন্দুকে যুদ্ধ চালাইতে পারে না।

(২) কিন্তু বর্তমানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। মহাযুদ্ধের এই তাণ্ডবতায় সৈন্য ও সাধারণকে তফাৎ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ১৯১৮ সালের পর জার্মাণ সেনাপতিরা দেখিলেন—আমিও যেমন প্রচুর অস্ত্র রণাঙ্গনে আনিতে পারি, শত্রুরাও তেমনি আনিতে পারিবে; আমিও যেমন প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিতে সক্ষম, শত্রুও তেমনি সক্ষম। অতএব আমার সৈন্য দিয়া শত্রুর সৈন্যকে সোজাসুজি আক্রমণ করিয়া ঘিরিয়া মারিব, এ আশা করা বৃথা। সেজন্য এবার তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য পড়িল মূল সৈন্যের প্রতি নয়, লক্ষ্য পড়িল সেই জনসাধারণের প্রতি যাহারা সৈন্যের জন্য রসদ ও আহার প্রস্তুত করিতেছে এবং যাহারা দেশের অভ্যন্তর হইতে রণাঙ্গনের পরিখা পর্যন্ত সেই রসদ ও আহার বহন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এদেরই আঘাত করিতে হইবে। ইহারা আহত ও অক্ষম হইলে শত্রু-সৈন্য হাল ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কী?

যুদ্ধ ও জনগণ

(ক) জার্মাণ সেনাপতিরা সৈন্যের পূর্বেকার সংগঠন ঢালিয়া সাজিলেন। ইহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করা হইল। ইহারা যুদ্ধ চালাইবার জন্য পশ্চাৎ বা পার্শ্ববর্তী সৈন্যের সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টা করিবে না। প্রতি দলের সঙ্গে কিছু ট্যাঙ্ক, কিছু কামান, কিছু বোমারু দেওয়া হইল। ইহাদের লক্ষ্য সজ্জিত শত্রু সৈন্য নয়। ইহাদের লক্ষ্য, কোনো মতে সম্মুখের শত্রু সৈন্যের বেড়ার ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া আঘাতে ও অত্যাচারে শত্রুব্যূহের পশ্চাতে নির্মম ভাবে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা। রাত্রের অন্ধকারে, নদীর বাঁকে, পর্বতের আড়ালে শত্রুর দুর্বল স্থান দিয়া যেভাবে পারে সেই ভাবে প্রবেশ করিয়া যে-জনসাধারণ আহার প্রস্তুত করিতেছে, যে-জনসাধারণ গোলাগুলি বানাইতেছে, এবং যে-জনসাধারণ এই আহার ও গোলাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাদেরই উপর নির্মম ও প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ইহারা বিহ্বল ও বিমূঢ় করিয়া দিবে। পুরাতন সেনাপতিরা ইহা শুনিয়া হয়ত বলিতেন, এই ছোট ছোট দল কোন সাহসে শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ করিবে, ইহাদের তো ঘিরিয়া ঘিরিয়া মারিয়া ফেলা যায়। যায় সত্য, কিন্তু একটাকে মারিতে আরেকটা আসিবে, বামের দলটিকে ঘিরিতে গেলে হয়ত দক্ষিণের দলটি ততক্ষণে বহুদূরে চলিয়া যাইবে। জার্মাণ সেনাপতিরা দেখিলেন, দশটি দলের ভিতর যদি সাতটি মরিয়া যায়, তবুও তিনটি দলই

যে বিশৃঙ্খলা আনিতে সক্ষম হইবে তাহাই যথেষ্ট। হইতেছেও তাহাই। নাৎসী সৈন্যদের আজ প্রধান লক্ষ্য হাতের অস্ত্র নয় : প্রধান লক্ষ্য, যে হাত, যে চক্ষু, যে মাংসপেশী সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে সাহায্য করিতেছে তাহাতেই আঘাত করা।

(খ) এই লক্ষ্যে আঘাত করিতে নূতন এক অস্ত্র অভিনব ভাবে সাহায্য করিতেছে। সে অস্ত্র হইল, বোমারু বিমান ; ইহার সাহায্যে আজ সৈন্যের লাইনকে পশ্চাতে ফেলিয়া জনসাধারণের অভ্যন্তরে আঘাত হানা সহজ হইয়া আসিয়াছে। মালয়ের যুদ্ধ বর্ণনা করিতে গিয়া একজন বলিয়াছিলেন, জাপানীদের বোমাবর্ষণের সম্মুখে যখন শ্রমিকদের কারখানায় রাখিয়া কাজ করানো সম্ভব হইতেছিল না, তখন আমরা কী করিয়া যুদ্ধ চালাইব। তাহাদের বোমার আঘাতে ভীত হইয়া বিপক্ষের শ্রমিকরা যাহাতে তাহাদের কল কারখানা ছাড়িয়া পালায় শত্রুরা ঠিক ইহাই চায়। কৃষক ও শ্রমিকই আজ শত্রুর লক্ষ্যস্থল। অতএব কৃষক ও শ্রমিককেই আজ সৈন্যের বুকের সাহস লইয়া বোমাবর্ষণের মুখে শক্ত মুঠায় কলের হাতল চালনা করিতে হইবে। সৈন্য ও জনসাধারণ আজ অভিন্ন।

(৩) এইখানেই শেষ নহে। জনসাধারণকে আজ স্থধু পরোক্ষভাবে যুদ্ধে সাহায্য করিলে চলিবে না। সে আজ যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পূর্বে যে ছোট ছোট দলে যুদ্ধ করিবার কৌশলের কথা বলিতেছিলাম,

তাহাই আরেক নূতন পরিস্থিতি আনিয়াছে। এই ছোট ছোট দল-যে পশ্চাৎ ও পার্শ্বের সৈন্যের সহিত যোগাযোগ না রাখিয়া শত্রুর দেশে প্রবেশ করিবে, দুইদিন পরে তাহার আহার ও রসদ কোথা হইতে জুটিবে? ইহারই সমাধান স্বরূপ, এই দলগুলিকে আদেশ দেওয়া হয় যে, তাহারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণকে কাজে লাগাইবে; অর্থাৎ তাহাদের জন্য এই জনসাধারণকে আপন গৃহ হইতে আহার আনিয়া দিতে হইবে, তাহাদিগকে শত্রুর মোটর চালাইবার জন্য জমা তৈল গৃহ হইতে আনিয়া দিতে হইবে, তাহাদিগকে শত্রুর অগ্রসরের জন্য মাটি কাটিয়া পথ বানাইতে হইবে, পাথর ভাঙিয়া সেতু ও প্রাচীর নির্মাণ করিতে হইবে, তাহাদিগকেই শত্রুর বন্দুকে গুলী জোগাইবার জন্য কারখানায় কাজ করিতে হইবে। এক কথায়, যে জনসাধারণ নিজের দেশের সৈন্যকে বাঁচাইয়া রাখিতেছিল, তাহাকে আবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া শত্রুর সৈন্য বাঁচাইয়া রাখিতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে হইবে। সেইজন্য আজ প্রতি জনপদে, প্রতি গ্রামে, প্রতি সহরে, প্রতি কারখানায় যদি দেশের জনগণ শত্রুর বোমাবর্ষণ ও আঘাতকে অবহেলা করিবার জন্য প্রস্তুত না হয়, শত্রুর সহযোগিতা করিবার দাবি ও জুলুমকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হয়, তবে যুদ্ধে জিতিবার আশা দুরাশা

মাত্র। হাতের অস্ত্র শানিত রাখিবার দিকে দৃষ্টি দিলে কী হইবে, সে হাতের গ্রন্থি যদি আজ শিথিল হইয়া আসে, সে হাতের পেশী যদি আজ দানবীয় অত্যাচারের ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, তবে সে শাণিত অস্ত্র শত্রুর রক্তে সিক্ত না হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।

শত্রুর এই মতলবকে বিফল করিবার জন্য জনসাধারণকে আজ কেবল বুকে সাহস লইয়া শত্রুর আক্রমণকে অবহেলা করিয়া কলের হাতল ও জমির লাঙল চালাইলেই চলিবে না। জনসাধারণকে আজ সক্রিয় পন্থায় শত্রুকে আঘাত হানিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। জনগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে শত্রুরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। ইহাই জনগণের সুযোগ। এই সুযোগ গ্রহণের পন্থা—গরিলা যুদ্ধ। গরিলা যুদ্ধই জনযুদ্ধের প্রধানতম অঙ্গ। চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া এই গরিলা যুদ্ধের উদাহরণ দেখাইয়াছে। ভারতবাসী অস্ত্রের জন্য আবেদন জানাইয়াছে। সে আবেদনও আজ যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তবু আমাদের পক্ষে শত্রুকে রুখিবার জন্য গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করা সম্ভব। বাঙলার মাটিতে সে গরিলাবাহিনী কেমন করিয়া দিনে দিনে গড়িয়া উঠিতে পারে,—আজ আমরা এই সমস্যারই সম্মুখীন হইয়াছি।

*

জনযুদ্ধই গরিলার ভিত্তি

এই গরিলাবাহিনী পত্তন করিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনযুদ্ধের আহ্বান। কিন্তু জনযুদ্ধের নামে প্রশ্নকে জটিল করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা দানবীয় দস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিব। পূর্ব এশিয়ার নির্মম হত্যাকারীরা পঙ্গপালের মতো ধাওয়া করিয়া আসিতেছে। মালয় গিয়াছে, ব্রহ্ম গিয়াছে, আন্দামান গিয়াছে, পূর্ব-ভারত কম্পিত বক্ষে অপেক্ষায় রহিয়াছে। মিত্রপক্ষ তাহার আপ্রাণ চেষ্টায় শত্রুকে রুখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই শত্রুকে ঠেকাইবার জন্য ভারতীয় সৈন্যরা, বৃটিশ ও আমেরিকার যুবকেরা আত্মাহুতিতে দিনের পর দিন রক্ত ক্ষরণ করিতেছে। ভারতকে রক্ষা করিবার এই সমস্যার সম্মুখে আমাদের কি কিছুই করণীয় নাই? যে জাতীয়-ভারতবর্ষ গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য এক একটি সংগ্রামে নিজস্ব পন্থায় আত্মবলিদান করিতে কখনও দ্বিধা করে নাই, যে জাতীয়-ভারতবর্ষ তাহার দেশকে—আপন গৃহকে রক্ষা করিয়া ফলেফুলে, ধনেজনে, জ্ঞানে ও গরিমায় পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য দেশাত্মবোধের আদর্শ গৃহে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, সেই জাতীয়-ভারতবর্ষের পক্ষে আজ এই নিদারুণ বিপদের দিনে জাপানীর বীভৎস আক্রমণ ও সম্ভাব্য

অত্যাচারের সম্মুখে কি কিছুই করিবার নাই? জাতীয়-ভারতবর্ষ একসময় জনগণের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের সম্ভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছিল, দেশকে ভালবাসিবার যে প্রেরণা দিয়াছিল, আমরা বিশ্বাস করিতে পারি সেই দেশাত্মবোধ, সেই দেশপ্রেম আজ ভারতবাসীকে শত্রুর উদ্যত বাহুর সম্মুখে নূতন জাগরণের উদ্দীপনা আনিয়া দিবে। কিন্তু শত্রুকে-যে রুখিব, ভারত-যে আত্মরক্ষা করিবে, তাহার পথ কই? পথ—জনযুদ্ধের আহ্বানে দেশকে জাগাইয়া তোলা—এই জাগ্রত জনগণের প্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা হইতেই গরিলাবাহিনী আপন তাগিদে জন্ম লইবে।

ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার সম্মুখে মিত্রপক্ষের সকল দেশগুলিই আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে—একমাত্র আমরাই এখনও নির্জীব হইয়া তামাসা দেখিতেছি; ভাবিতেছি, চট্টগ্রাম আমার নহে, বরিশাল আমার দেশ নহে, খুলনা আমার নহে, বাঙলা আমার দেশ নহে। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী এখনও কি তাহার দেশকে চিনিবে না? ব্রহ্ম আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চীনের অধিনায়ক মার্শাল চিয়াং ছুটিয়া আসিয়া ভারতকে আত্মরক্ষার দায়িত্ববোধে সজাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। বৃটিশ জনসাধারণ অতীতের সকল গ্লানি ভুলিয়া ভারতকে একত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য পথ-সন্ধানে তাহাদের প্রতি-

নিধিকে ভারতে পাঠাইল। কিন্তু নিষ্ক্রিয় আমরা এখনও শত্রুকে দ্বারপ্রান্ত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ভারতবাসীকে একতা বন্ধনে দাঁড়াইবার আহ্বান জানাইলাম না! দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা চীনের ইতিহাস হইতে এখনও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যে সত্য প্রমাণ করিতে চীন-বাসীরা চীনের প্রান্তরে প্রান্তরে অফুরন্ত রক্ত ঢালিয়াছে, সে সত্য আজিও আমাদের কাছে ধরা দিল না। চীনের প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে এই-যে দৃঢ় একতা দেখিতেছি, তাহার প্রেরণা ও উপলব্ধি আনিতে তাহাকে পাঁচ-পাঁচটি প্রদেশকে বলি দিতে হইয়াছিল। জাপান যখন একে একে পূর্ব প্রান্তের পাঁচটি প্রদেশ নিদারুণ অত্যাচারে ছিনাইয়া লইয়াছিল তখন নাৎসীর বীভৎস আচরণে আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া গোটা চীন জাতি মার্শাল চিয়াঙের নেতৃত্বে অস্ত্রধারণ করিল। আমরা কি আজ চীনের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিব না! আমরাও কি একে একে বাঙলা আসাম মাদ্রাজকে বলি দিয়া তবে বুঝিব যে, এই যুদ্ধ আমাদের জাতীয় যুদ্ধ?

কিন্তু ভারত বা বৃটেনকে রক্ষা করিবার জন্য জনযুদ্ধের কথা উঠিতেছে কেন? কারণ অন্য কোনো পথ নাই। নাৎসীরা যে ক্ষুরধার অস্ত্র লইয়া সৈন্যকে ডিঙাইয়া জনসাধারণকে আক্রমণ ও অত্যাচারে বিভ্রান্ত করিতেছে, নাৎসীরা যে মিথ্যা আশায় ও প্রলোভনে জনসাধারণকে বিহ্বল করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত

করিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে লড়িবার একমাত্র পথ জনযুদ্ধ। আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে ও গৃহে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া তাহাকে নূতন কল্যাণ-আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; অনতিভবিষ্যতে তাহাদের যে অবশ্যম্ভাবী মুক্তি আসিবে তাহার সূত্রপাত এখনই স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে,—মারো, তোমার শত্রুকে মারো। জনসাধারণের এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সম্মুখে নাৎসীর হিংস্রতা মত্ততা ও দুর্ধর্ষতা যে ব্যর্থ আস্ফালনে দুর্বল হইয়া পড়িবে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—রাশিয়া ও চীন।

জনযুদ্ধের মূল কথা হইতেছে—প্রত্যেক জন-যোদ্ধা তাহার মৃত্যুর পূর্বে যেন জানিয়া যাইতে পারে যে, তাহার আত্মবলি-দানে, তাহার তাজা রক্তের প্লাবনে তাহার দেশের গৃহের আপন জনের শত শত বৎসরের বন্ধনকে সে শিথিল করিয়া গেল; এবং জনসাধারণ যেন জানিতে পারে যে, শত্রুর অত্যাচারের গ্লানি বহন করিয়াও অনাহারে ও নিদারুণ পরিশ্রমে যে-অস্ত্র যে-রসদ যে-আহার তাহারা যোদ্ধার হাতে তুলিয়া দিল, সে-সমস্তই যেন আগামী কালের মানুষের বন্ধনকে ছিন্ন করে। সৈন্য যেন জানে, তাহার মৃত্যুতে সে নূতন সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেল; জনসাধারণ যেন জানে, শত্রুর অত্যা-চারের যে-বিষকে সে স্বেচ্ছায় গলাধঃকরণ করিল, তাহা আগামী কালের সকল মানুষের মঙ্গল ও শিবের জন্য।

এই মহান উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে সৈন্য ও জনসাধারণকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। গত ২৬-৩-৪২ তারিখে এক বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—

"The latest refinements of science are linked with the cruelty of stone age. Workshops and fighting line are one. All may fall, all will stand together. We must aid each other, we must stand by each other."

অর্থাৎ, আদিম কালে যেমন জনসাধারণ ও যোদ্ধার মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না, যেমন যুদ্ধের তাণ্ডবতার দুর্ভোগ জনসাধারণ ও যোদ্ধাকে সমরূপেই ভোগ করিতে হইত, তেমনি আজ মনুষ্য সমাজের চরম ক্রমোন্নতিতে প্রায় একই অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। কর্মশালা ও যুদ্ধক্ষেত্র আজ অভেদ্য; সৈন্য ও জনগণে আজ তফাৎ থাকিতেছে না। একসাথে উঠিতে হইবে, না হয় একসাথে মরিতে হইবে। সৈন্যকেও যেমন জনগণের দুঃখ কষ্ট দেখিতে হইবে, জনগণকেও তেমনি সৈন্যের দুঃখ কষ্ট দেখিতে হইবে।

মিঃ চার্চ্চিলের এই দূরদৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া আমরা বলিতে পারি—যদি একান্ত আমাদেরই এই ভারতভূমিকে নাৎসী আক্রমণের সম্মুখে রক্ষা করিতে হয়, তবে অবিলম্বে নিম্নোক্ত চারিটি বিষয় কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

(১) ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দল অতীতের সমস্ত

বিবাদ ও বিভেদ ভুলিয়া স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একত্রে দণ্ডায়মান হউক এবং ধীরে ধীরে ভারতরক্ষার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করুক। তাহারা ভারতীয় সৈন্য দলকে আবেদন জানাক যে—তোমরা সংগ্রাম করো, আমরা তোমাদের পক্ষে রহিয়াছি। কর্তৃপক্ষ আজ আমাদের হাতে কতটুকু ক্ষমতা দিলেন, ইহা আজ বড় প্রশ্ন নয়; আজ প্রশ্ন, আমরা কতটুকু সঙ্ঘবদ্ধভাবে সে ক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। বাঙলা বা মাদ্রাজ আজ যে-কোনো দিন সমগ্রভাবে আক্রান্ত হইতে পারে। এই আক্রমণকে রুখিবার জন্য দেশবাসীর নিকট, সৈন্যদলের নিকট কি আমাদের কোনো আবেদন নাই? শত্রুর নির্মম আঘাতে আজ কর্তৃপক্ষ বুঝিতেছেন, স্বাধীনতার বাণী এখনও গৃহে গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে না পারিলে মালয় ও দক্ষিণ ব্রহ্মে যাহা ঘটিয়াছে, ভারতেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে। কালের এই ইঙ্গিতকে কি এখনও আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না? মার্শাল চিয়াঙের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ লেটিমার সেদিন বলিয়াছেন, "যাহাকেই আজ প্রশ্ন করো, প্রাচ্য রণাঙ্গনের নেতা ও ভরসার স্থল কে? সকলেই উত্তর দিবে—চীন। অতএব এশিয়াবাসীর যে-কেহ চীনের সহিত ও মিত্র-পক্ষের সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, স্বাধীনতা তাহাদের অনিবার্য।—বৃটিশের প্রতিনিধি ও জন-সাধারণ, চীনের নেতা ও অধিবাসী এবং সোভিয়েট রাশিয়ার

লালফৌজের আশ্বাসে আমরা কি এখনও আশ্বস্ত হইতে পারি না যে, এই মহা সংগ্রাম আমাদেরও স্বাধীনতারই সংগ্রাম !

(২) কিন্তু সুধু আবেদনে শত শত বৎসরের গ্লানি মুছিয়া যাইবে না। সৈন্য ও জনসাধারণে আজ প্রভেদ ঘুচিয়াছে। সৈন্য ও কৃষক, সৈন্য ও শ্রমিক আজ অভেদ্য ঃ

"Workshops and fighting line are one."

সেইজন্য এই আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ ও দৈন্য লাঘব করিবার সম্ভবমতে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের দুঃখ দৈন্য ও দাবি জানাইবার অবকাশ দিতে হইবে। বলিতে হইবে,—তোমরা সংহত হও, এবং সেই সংহত শক্তিকে দ্বিগুণতরভাবে কাজে লাগাইয়া তোমার সৈন্যের হাতে অস্ত্র আহার ও রসদ পৌঁছাইয়া দিয়া তোমার মাতৃভূমিকে রক্ষা করো ! শত্রু আজ তোমার পূর্বদ্বারে।

(৩) মস্কো ও লেনিনগ্রাডকে রক্ষা করিবার জন্য সে দেশের অধিবাসীদের ষ্ট্যালিন জানাইয়াছিলেন—

"Whoever can lift an arm, must have one."

আজ বৃটেনের গ্রামে-গ্রামেও নাৎসী অভিযানকে রুখিবার জন্য হোমগার্ডবাহিনী সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষ হিটলারকে ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের দেশেও জনগণের সশস্ত্র

বাহিনী সৃষ্টি করিতে হইবে। অন্য কোথাও সম্ভব না হউক, ভারতের পূর্বপ্রান্তে বাঙলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলে জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিয়া জাপানীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে। সেই সশস্ত্র জনবাহিনীগুলিকে সাধারণ সৈন্যদলের অধীনে থাকিবার কোনো বিশেষ আবশ্যক নাই। তাহারা স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিবে এবং যখন কোনো অঞ্চল শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইবে তখন স্থানীয় বাহিনী সেই অঞ্চলে অবস্থিত সাধারণ সৈন্যদলের উপদেশ ও সুবিধামতো কাজ করিবে। ইহাদের হাতের অস্ত্র হইবে রাইফেল বা ছোট ব্রেণগান এবং এই অস্ত্র তাহারা নিজের গৃহে বা নিজের সঙ্গে লইয়া চলাফেরা করিতে পারিবে। এই জনবাহিনীর অস্ত্রচালনা শিক্ষা অবিলম্বে আরম্ভ করা আবশ্যক। প্রশ্ন আসিবে, অস্ত্র কোথায় মিলিবে? ভারতীয় শ্রমিক যদি জানে যে তাহার নির্মিত অস্ত্র তাহার গৃহ ও কারখানা রক্ষা করিবার জন্য তাহারই হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে, তবে দেখা যাইবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পরিশ্রম করিয়া আপন উদ্যমে তাহারা হাজারে হাজারে রাইফেল প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেছে। সমস্যা অস্ত্রের নহে,—সমস্যা, সমূহ বিপদকে উপলব্ধি করিতে পারা বা না পারায়।

(৪) শত্রু যদি আসিয়াই পড়ে তবে তাহার অধিকৃত অঞ্চলে এই জনবাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামে গ্রামে বনে

জঙ্গলে প্রান্তরে প্রান্তরে গরিলা দল জন্ম লইবে। জনগণের এই বাহিনীর কাজ হইবে—অধিকৃত দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের মারমুখো করিয়া তোলা। এই গরিলা-বাহিনী শত্রুর পশ্চাতে তাহার আহার রসদ ও যাতায়াতের ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া শত্রুর অগ্রগতি মন্থর ও বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। আমরা কি আশা করিতে পারি না, যে-দেশে শিবাজী জন্ম নিয়াছিলেন, যে-দেশে তান্তিয়া তোপের উত্থান সম্ভব হইয়াছিল, সে দেশের মাটিতে নাৎসীর কবল হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে, দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনে, মাদ্রাজের গিরি-গহ্বরে দুর্জয় "মাওয়ালি বাহিনী" উদ্যত সঙ্গীনে নির্দয় মানব-শত্রুকে নির্মম শিক্ষা দিতে আবার জন্ম লইবে!

(৩)

গরিলা যুদ্ধের নীতি

"It was not only a war between two armies but was a great war of the whole Soviet people against German Fascist troops."

—Stalin

১৯১৭ সালের এক দুরূহ শীতের মাঝে সুদূর মস্কো দেশে জনগণের বুকের রক্তে সাম্যের বাণী লইয়া গণবিপ্লব জন্ম লইয়াছিল। তারপর আজ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সাম্যবাদকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য সে দেশের জনগণ কী নিদারুণই-না পরিশ্রম ও উৎসাহ দেখাইয়াছে। ধনতন্ত্রের নির্লজ্জ জাতীয়তার মুখোস পরা সমাজের সম্মুখে সাম্যবাদী সমাজের উজ্জ্বল, উন্নত ও সুশৃঙ্খল রূপ ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিল। আজ ফলে ও ফুলে সজ্জিত, বাণিজ্যে ও কৃষিতে উন্নত, সাহিত্যে ও শিল্পে ভূষিত, আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে মুখরিত সে সাম্যবাদীর দেশ আক্রান্ত। সে আত্মরক্ষা করিবেই। যে জনগণ পঁচিশ বৎসর পূর্বে রুশ বিপ্লবকে রূপ দিয়াছিল, সেই জনগণের কাছে ষ্ট্যালিনের আহ্বান আসিয়াছে। কেবলমাত্র তৈরি মজুত সৈন্যকে নয়, সমগ্র রুশ জনগণকে আজ বর্বর নাৎসী আক্রমণ রুখিতে হইবে। কিন্তু যে নৃশংস নাৎসীসৈন্যকে আপাদমস্তক বর্মসজ্জিত

ইয়োরোপের অন্যান্য সৈন্যরা রুখিতে পারিল না, তাহাকে নগ্নদেহে জনগণ কী করিয়া আগল দিবে? চীনের সাম্যবাদীরা পথ দেখাইয়াছে—গরিলা যুদ্ধ করো।

গরিলা যুদ্ধের নামে আমাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়। মনে হয় যেন, ইহা আমাদের নিজেদেরই কথা। ট্যাঙ্ক, বোমারু, হাউট্জার—ইহারা আমাদের কাছে অপরিচিত; ইহাদের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। কিন্তু গরিলা যুদ্ধের আহ্বানে যেন আমাদের মন সাড়া দেয়। এই গরিলা যুদ্ধের নীতি-যে আমাদের দেশের মাটিতেই জন্ম লইয়াছিল! মারাঠার পর্বতে পর্বতে, মধ্যভারতের নিবিড় জঙ্গলে জঙ্গলে ইহার প্রথম জন্ম। শিবাজীর অমোঘ আহ্বানে জগতের ইতিহাসে প্রথম গরিলা-বাহিনীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কে বিরাট সজ্জিত মোগলবাহিনীকে রুখিতে "পর্বত মূষিক" এই সিংহসম বর্গীদার ও শিল্লিদার গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারত সম্রাটের শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী তাহাকে রুখিতে পারিল না। দূরে ঐ সুসজ্জিত বিশাল মোগলবাহিনী আসিতেছে। এদিকে অল্প গোটা-কয়েক অশ্বারোহী। নগ্ন অশ্ব, নগ্ন সোয়ার, হাতে দীর্ঘ বল্লম ও কটিদেশে কাপড়ের আঁচলে শুষ্ক আহার্য এক মুঠা ছোলা। দীর্ঘকায় শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত সেনাপতি শিবাজীর আদেশ আসিল, পালাও। মুহূর্ত মাঝে বর্গীরা পাহাড়ের গুহায় নিশ্চিহ্ন হইল। সন্ধ্যা আসিয়াছে;

মোগল সৈন্য বিশ্রাম লইতে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বর্গীদের অশ্বের খুরে পর্বত-গাত্রে স্ফুলিঙ্গ খেলিয়া গেল। এলোপাথাড়ি আঘাতে মোগল সৈন্যকে বিমূঢ় ও ছত্রভঙ্গ করিয়া "পর্বত মূষিকের" গরিলাবাহিনী উধাও হইল।

ইহার পর আরেকবার আমরা ভারতের ইতিহাসে এই গরিলা-নীতির খেলা দেখিয়াছি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের তাণ্ডবতার মধ্যে মধ্যভারতে "তান্তিয়া তোপে" বৃটিশবাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কতবার-যে সে কোম্পানি-সৈন্যের কাছে হারিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু হারিবার সাথে সাথে মধ্যভারতের নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া অনতিবিলম্বে আবার কোথা হইতে সৈন্য যোগাড় করিয়া নিকটে আরেকটি ঘাঁটিতে আঘাত হানিয়াছে। নিজেরও বিরাম নাই, শত্রুকেও বিশ্রাম দেয় নাই। কাণপুর, শেওরাজ-পুর, কল্পি, কুঞ্চ, জওরা, পাটান, ইশাওয়াগড়, প্রতাপগড়, দেওঘর প্রভৃতি যুদ্ধগুলির কাহিনী আজিও তান্তিয়া তোপেকে মধ্যভারতের লোকের কাছে "যাদুকর" বানাইয়া রাখিয়াছে। গরিলা যুদ্ধের রোমাঞ্চকর ইতিহাস ভারতের মাটিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইয়োরোপের ইতিহাসে গরিলা যুদ্ধ পেনিন্সুলার যুদ্ধে (১৮০৮-১৮১৪) প্রথম দেখা দিয়াছিল। গরিলা যুদ্ধের নাম-করণও স্পেনীয় ভাষা হইতে আসিয়াছে। নেপোলিয়ানের

অগ্রগতিকে বাধা দিবার জন্য স্পেনীয় জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া সুদক্ষ বৃটিশ সেনাপতি ওয়েলিংটনের অধীনে ফরাসী বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আদর্শের অভাবে এই গরিলাবাহিনীগুলি অবশেষে ডাকাতের দলে পরিণত হয়।

পুরাতন অস্ত্রের সম্মুখে গরিলা-নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইলেও আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান ছিল। কিন্তু তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চরিত্রের অধিনায়কত্বে। গত মহাযুদ্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লরেন্স স্বাধীনতার আহ্বানে আরবের দুর্ধর্ষ বেদুইনদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। এইবার শিবাজীর অশ্বারোহী নহে, আরবের ধূ-ধূ মরু-প্রান্তরে উট-বাহিনীর দুর্ধর্ষতা ও উদ্দামতা। মরুভূমির বালুর ঝড়ের মতো ত্রিশ মাইল বেগে বেদুইন উটবাহিনী তুর্কীর রেলযাত্রী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া পুনরায় উটপদবিক্ষেপে বালুর রাশি শূন্যে উড়াইয়া সীমাহীন মরুর বক্ষে গা-ঢাকা দিয়াছে। দুর্দান্ত মরুর মাঝে কে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবে?

গরিলা যুদ্ধ শেষ রূপ লইয়াছে সাম্যবাদীর হাতে চীনের নিবিড় পর্বতে ও রাশিয়ার দীর্ঘ প্রান্তরে। সাম্যবাদীরা যে আদর্শের বাণী দিয়াছে, তাহাতে জনগণ আজ অনুপ্রাণিত। জনগণ অনুভব করিয়াছে, ইহাই তাহাদের হাজার হাজার

বৎসরের বন্ধন হইতে মুক্তির পথ। শোষণের ভিত্তিকে ভূমিসাৎ করিতে হইলে ইহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যদিকে, জনগণ গরিলা যুদ্ধকে সহজেই বুঝিয়া লইতে পারে। আদিমকালে সে যখন প্রথম সমাজ গড়িয়া তুলিতেছিল, সে-সমাজকে প্রকৃতির ধ্বংসকারী দুর্ঘটনা ও হিংস্র বিরাটকায় প্রাণীর হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব নির্ভর করিত জনগণেরই উপর। বিপদ-কালে যেভাবে পারিয়াছে সেই ভাবেই তাহারা শত্রুকে আঘাত হানিয়াছে। আবশ্যক হইলে পালাইয়াছে, আবার সময়মতো মরিয়া হইয়া আক্রমণ করিয়াছে। এই গরিলা যুদ্ধে জনগণ আদিম কাল হইতে অভ্যস্ত। মধ্যযুগে সামন্তরা ও পরবর্তী যুগে পুঁজিপতিরা আর্থিক ব্যবস্থার অন্তরালে সমাজব্যবস্থার দায়িত্ব জনগণের হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তাই এই দুই যুগে সামন্তদের ও পুঁজিপতিদের অন্তর-কলহে জনগণ কোনো প্রাণের সাড়া পায় নাই; সুধু দেখিয়াছে, তাহাদের শোষণ করিবার সুবিধা গ্রহণের জন্য কাড়াকাড়ি। যুদ্ধ তাহারা করিয়াছে সত্য, তবে তাহা প্রভুর বেগার খাটিবার জন্য। কিন্তু সাম্যবাদীর আহ্বানে জনগণ আজ তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার শত বন্ধন হইতে মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে। সেই আদিমকালে সে যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে গরিলা-নীতি লইয়াছিল, এবারও সে তেমনি গরিলা যুদ্ধের আহ্বানে অপূর্ব উদ্দামতা অনুভব করিবে। এই শত্রুকে না মারিলে-যে তাহারই আপন

ঘর, আপন সমাজ, আপন আদর্শ ধূলিসাৎ হইবে। এই শত্রুকে সে আজ একক হইলে একক, ছোট দলে হইলে ছোট দলে, বিরাট বাহিনীতে হইলে বিরাট বাহিনীতে, যেভাবে যেখানে পারে সেখানেই আঘাত হানিবে। সাম্যবাদী নেতার নিকট হইতে গরিলা যুদ্ধের আহ্বান জনগণের রক্তের শিরায় শিরায় শিহরণ আনিবে।

* * *

নেপোলিয়ানের পর রণনীতির বিখ্যাত স্রষ্টা জার্মাণীর ক্লসুইজ এবং ফরাসীর ফচ্। ক্লসুইজ বলিতেন—Victory could only be purchased by blood—নিজের প্রভূত ক্ষতি ও ক্ষয় মানিয়া লইয়াই তবে যুদ্ধে জিতিবার আশা করা যাইতে পারে। এবং ফচ্ তাঁহার বিখ্যাত রণনীতির পুস্তকে লিখিয়াছেন—The aim of war is the destruction of the organised forces of the enemy...by the one process battle—লড়াইয়ের মোট উদ্দেশ্য হইবে, সুশৃঙ্খল পরিকল্পনানুযায়ী উদ্ভূত একটি যুদ্ধের দ্বারাই শত্রুর সংহত শক্তিকে বিনাশ করা। গরিলা-যোদ্ধা লরেন্স এই পুঁথিপড়া মামুলি সূত্রকে ঠাট্টা করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, ক্লসুইজ যদি আরবে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তুর্কী-বেদুইন যুদ্ধে কখনও জয়লাভের কথা ভাবিতে পারিতেন না; কেননা, বেদুইনরা ক্ষয় ও ক্ষতিকে কখনও

মানিয়া লইতে চাহে নাই। আর ফচ্ যদি তুর্কীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনিও তুর্কী-বেদুইন যুদ্ধে কখনও যুদ্ধের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইতেন না; কেননা, বেদুইনদের সংহত শক্তি বলিতে কিছু ছিল না।

গরিলা যুদ্ধে এই দুইটি কথাই বড়, (১) শক্তি সংহত বা সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে না; এবং (২) ক্ষয় ও ক্ষতিকে স্বীকার করা হইবে না।

(১) যদি আমাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত ও সংহত থাকে, তবে শত্রু একবার সুবিধামতো আমাকে বেড় দিতে পারিলেই আমার শক্তিকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু আমার শক্তি যদি ইতস্ততঃ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে তবে তাহার একটিকে হারাইলে, আরেকটি আছে, আবার সেটিকে হারাইলেও তৃতীয়টি আছে। আরবের মরুভূমিতে বেদুইনরা এলহাসায় হারিলে, আমানে আঘাত করিবে; আবার আমানে হারিতে না হারিতে দেরহতেই আক্রমণ শুরু হইয়া গেল। বর্গীদের একটি বাহিনী বিজাপুরে হারিতে না হারিতে, সাতারা তাহাদের দখলে আসে; পুণাতে হারিলেও আসিরগড় তাহারা দখল করে। চীনা লাল-গরিলারা যেদিন হোনানে হারিল, সেদিনই হয়ত হোনানে আসিবার রেল লাইন দখল করিয়া বসিল। এই কৌশলের ফলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উঠে এবং দেশ দখল করিলেও দেশবাসীকে করায়ত্ত করা সম্ভব হইয়া

উঠে না। কিন্তু দ্বন্দ্বরত দুইশক্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অনভিজ্ঞ শক্তিকে এই গরিলা-নীতিই গ্রহণ করিতে হয় বা গ্রহণ করা কর্তব্য। শক্তিশালী মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে শিবাজী, নেপোলিয়ানের বিজয়বাহিনীর বিরুদ্ধে স্পেনবাসীরা, জাগ্রত তুর্কী শক্তির সম্মুখে যাযাবর বেদুইন জাতির নেতা লরেন্স, আধুনিকতম অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত জাপানীদলের সম্মুখে চুটে এবং মাও সেতুং, আর অবশেষে দুর্ধর্ষ ও বর্বর সমর-কৌশলী নাৎসীবাহিনীর বিরুদ্ধে রুশ জনগণ, বুদ্ধিমানের মতো এই গরিলা-নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু শক্তিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ চাই। (ক) প্রথমত, বিস্তীর্ণ স্থান চাই। সীমাবদ্ধ স্থানে শক্তিকে ছোট ছোট দলে যুদ্ধ করানো সম্ভব নয়; কারণ, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে অধিকতর শক্তিশালী শত্রুসৈন্য জাল দিয়া মাছ মারিবার মতো বেড় দিয়া বিক্ষিপ্ত দলগুলিকে শিকার করিবে। কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোনো একস্থানে আটক পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই অন্যত্র ঘুরিয়া পালাইয়া পাল্টা আঘাত হানিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

(খ) দ্বিতীয়ত, দুর্গম স্থানই অধিকতর সুবিধাজনক। কারণ দুর্গম স্থানে শত্রুর বিরাট বাহিনী অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে না। একটি বিশাল বাহিনীকে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহার

রেল লাইন চাই, রাস্তা চাই, আশ্রয়স্থল চাই এবং স্থানীয় ঘাঁটিতে রসদও চাই। গরিলাবাহিনীকে এই সকল বিড়ম্বনার কথা ভাবিতে হয় না। তাহারা ছোট ছোট দলে যেখানে সেখানে পালাইয়া চলিয়া যাইতে পারে, বা অপ্রত্যাশিত দিক হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিতেও পারে। মারাঠার পর্বতবহুল স্থানে, মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ জঙ্গলে, আরবের বিশাল মরু-ভূমিতে, চীনের দুর্গম পর্বতকান্তারে, সেইজন্যই গরিলাযুদ্ধ এতটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল বা হইতেছে।

(গ) তৃতীয়ত, গতিশীলতা চাই। ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন করিলেই সৈন্যের গতিক্ষমতা বাড়িয়া যায়। বিশাল বাহিনীকে অগ্রসর করাইতে তাহার বিরাট লটবহরকেও পিছনে পিছনে টানিতে হয়। মোটর প্রভৃতি যানবাহনের আবির্ভাব হইলেও তাহাকে চালাইতে রাস্তা চাই, নদী অতিক্রম করিবার পুল চাই, পাহাড় কাটিয়া বাহির হইবার সুড়ঙ্গও চাই। কিন্তু ছোট ছোট দলের স্বাভাবিকভাবে গতি থাকিলেও, কৃত্রিম গতির সাহায্যও চাই। কারণ, শত্রু পিছনে ধাবিত হইলে তাহাকে এড়াইয়া অন্য ঘাঁটিতে শত্রুর অগ্রে পৌঁছাইয়া সেখানে আক্রমণ করিতে হইবে। সেইজন্য শিবাজীর বর্গীরা অশ্বারোহী, লরেন্সের বেদুইনরা উটবাহী।

(ঘ) চতুর্থত, গরিলা যুদ্ধে দুর্ধর্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু জাতি চাই। সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যদলকে নানা ব্যবস্থায় আরাম বা বিশ্রাম বা

মেডিক্যাল সাহায্য দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু গরিলা-যোদ্ধাদের অখ্যাত কুখ্যাত স্থানে, অনাহারে অনাশ্রয়ে, সবার অজানিতে সহস্র বাধা বিপত্তি ও প্রভূত কষ্ট যন্ত্রণা অম্লানে সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

(ঙ) পঞ্চমত, এই সকল কথা বাদে প্রত্যেক গরিলা-যোদ্ধার চাই, নিখুঁত ভৌগোলিক জ্ঞান। এই ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর গরিলা যুদ্ধের কৃতকার্যতা সর্বাপেক্ষা নির্ভর করে। ১৮৫৭ সালে তাত্তিয়া তোপে-যে বৃটিশ শক্তিকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল, তাহার কারণ মধ্যভারত তাত্তিয়া তোপের নখদর্পণে ছিল। তাহার গতি বা চলাচল বৃটিশ সেনাপতিদের অনুসরণ করা কঠিন ছিল। কল্পি হইতে কুঞ্চ বা পাঠান হইতে ঝাঁসি কোন পথে বা বিপথে তাত্তিয়া হাজির হইত, তাহা সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। লরেন্স বার-বার এই ভৌগোলিক জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) এ পর্যন্ত আমরা শক্তিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করিবার আবশ্যিক ব্যবস্থা বা অবস্থাগুলি দেখিলাম। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া ক্ষয় ও ক্ষতিকে স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ করিবে, ইহাই সমস্যা। (ক) প্রথমত, একটা সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধে ছোট ছোট দল লইয়া পিনের আঁচড় দিয়া লাভ নাই। তাহাতে ছোট দলগুলিই ধীরে ধীরে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িবে।

"It should not seek for his main strength or his weakness, but for his materials."—Lawrence.

একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীকে তাজা ও যুদ্ধোপযোগী রাখিতে হইলে তাহার জন্য তেমনি বিরাট আয়োজনে আহার ও রসদের ব্যবস্থা করিতে হয়। গরিলাবাহিনীর ইহাই সুযোগ। এইখানেই আঘাত করো। আহার ও রসদ না জুটিলে, সে যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিবেই। রাইফেল আপনা হইতেই সে মুষ্টি হইতে খসিয়া পড়িবে। তুর্কীবাহিনী তখন মেদিনা দখল করিয়াছে ; করুক। কিন্তু তাহাদের রসদ ও আহার আলেপ্পো-মেদিনা রেল লাইন দিয়াই লইতে হইবে। ইহাই সুযোগ ; লরেন্স তাঁহার দুর্ধর্ষ বেদুইন গরিলাবাহিনী লইয়া এই আহার ও রসদের উৎস-পথকে আঘাত করিতে লাগিলেন। গরিলা যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য, শত্রুর এই রসদ-ব্যবস্থাগুলিকে অচল করা। কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষে তাহার রসদ বা আহার আসিবার সারা পথকে শক্তিশালী আগল দিয়া পুরাপুরি নিরাপদ রাখিতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। যদি তাহা করিতে হয় তবে তাহার আসল যুদ্ধের কথা ভুলিয়া এই ঘাঁটি ও পথ আগল দিয়াই দিন কাটাইতে হইবে।

(ক) দ্বিতীয়ত, 'tactics should be tip and run ; not pushes but strokes', ছোঁ মারিবার মতো কোনো স্থানে তীব্র

বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এলোপাথাড়ি আঘাত করিয়া আবার পর মুহূর্তে তীব্র বেগে উধাও হইতে হইবে। হয়ত কোথাও কৃতকার্য হওয়া গেল; কিন্তু তাই বলিয়া ভবিষ্যতে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সেখানে ঘাঁটি বাঁধিতে গেলে চলিবে না। সেই মুহূর্তে আবার অন্যত্র তেমনি তীব্রবেগে আঘাত করিবার জন্য ছুটিতে হইবে। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো স্থানের সাময়িক কৃতকার্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে গিয়া ছোট গরিলাবাহিনীকে সমূহ বিপদে পড়িতেই দেখা গিয়াছে। সেইজন্য ইহার একমাত্র নীতি হইবে—মারো, পালাও, আবার মারো, আবার পালাও। নিজের ক্ষয় ও ক্ষতিকে স্বীকার না করিয়াই শত্রুকে তিলে তিলে অনাহারে ও অনাশ্রয়ে মারিতে হইবে।

(খ) তৃতীয়ত, নিজের বিনাক্ষতিতে শত্রুকে ক্ষত করিবার জন্য গরিলাবাহিনী যুগে যুগে এক অভিনব পন্থা লইয়াছে। তাহার নীতি 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান নয়। অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণের দ্বারা শত্রুকে আচম্বিত করাই তাহার কৌশল। আচম্বিত মুহূর্তে মানুষ তাহার আপন শক্তিকে সংহত করিয়া পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারে না। ঘুমন্ত ব্যাঘ্রকেও একটি লাঠির আঘাতে বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত করিতে পারা যায়। শত্রুকে আচম্বিত করিবার গরিলাবাহিনীর প্রধান অস্ত্র—তীব্র গতি ও দুর্ধর্ষতা। ইহা ভিন্ন তাহার তৃতীয়

অস্ত্র হইতেছে—শত্রুকে ভাঁওতা বা ফাঁকি দেওয়া। দক্ষ গরিলা-যোদ্ধা শিবাজী বার-বার অদ্ভুত ভাঁওতা দিয়া মোগল সৈন্যকে বিহ্বল করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সেরা হইল, পুনায় বিবাহ শোভাযাত্রার ভান করিয়া সায়স্তা খাঁকে যখন তিনি প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পালাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মজা এই, সেদিনও ১৯৩৮ সালে চীনা গরিলাবাহিনী ঠিক একই ভাবে সৈন্যদের বিবাহের বরযাত্রী সাজাইয়া চীনের অভ্যন্তরে একটি ছোট সহর হইতে জাপানীদের বিতাড়িত করিয়াছিল।

ইহার পর আমাদের একটি কথা মনে আসিবে যে, সত্যই কি একটা বিরাট সংহত বাহিনীকে সুধু মাত্র গরিলাবাহিনী দিয়া পরাজয় করা সম্ভবপর। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। এই খণ্ড খণ্ড গরিলাবাহিনীর পিছনে শক্তির উৎস হিসাবে যদি কোনো সঙ্ঘবদ্ধ বাহিনী না থাকে, তবে শত্রুকে ক্ষত বিক্ষত করা যাইতে পারে কিন্তু খতম করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত গরিলা-যোদ্ধা লরেন্স অবশ্য একথা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অস্বীকার করিলে কী হইবে, তাঁহাকেও তুর্কী বাহিনীকে পূর্ণভাবে খতম বা ঘায়েল করিতে এলেন্‌বির সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। লরেন্স অবশ্য এলেন্‌বিকে যুদ্ধ জয়ের জন্য ধন্যবাদ দিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি এলেন্‌বির জন্য প্রমাণ করিতে

পারিলেন না যে,—সুধু গরিলাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ধারণ করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, পেনিন্‌সুলার যুদ্ধে গরিলাবাহিনীর আশ্রয় হিসাবে ওয়েলিংটনের বৃটিশবাহিনীকে, শিবাজীর বর্গীদলের সাথে সুশিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ মাওয়ালি বাহিনীকে, চীনের লাল গরিলা বাহিনীর সঙ্গে শক্তির উৎস হিসাবে অষ্টম রুট আর্মিকে, বা লাল ফৌজকে। ইয়োরোপের ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি, রোমের পতনের পর হইতে অশ্বারোহী সৈন্যের মর্যাদা বাড়িল। শেষ পর্যন্ত এমন হইয়াছিল যে, একটা দেশের গোটা সৈন্যবাহিনীতে একটিও পদাতিক সৈন্য ছিল না। অশ্বারোহী সৈন্য দিয়াই তাহারা যুদ্ধ জয় করিতে চায়। ইহার শেষ পরিণতি হইয়াছিল ক্রুসেডের যুদ্ধে। পদাতিক সৈন্যের অভাবে অশ্বারোহীরা শক্তির উৎস হারাইল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদে পড়িলে পদাতিকের পশ্চাতে অশ্বারোহীদের আশ্রয় লইবার আর উপায় রহিল না। ফলে ইয়োরোপীয় শক্তি পশ্চিম এশিয়া হইতে পরাজিত হইয়া ফিরিল। ঠিক তেমনি আজ সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহত সৈন্যবাহিনী না রাখিয়া সুধু গরিলা দলের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে গেলে পরাজয়ের গ্লানিই বহন করিতে হইবে।

সোভিয়েটের লাল ফৌজ বৎসরাধিক কাল নৃশংস নাৎসী আক্রমণ ব্যাহত করিয়া রাখিয়াছে। এই মূল লাল ফৌজকে সাহায্য করিবার জন্য ষ্ট্যালিন আদেশ দিয়াছেন—

গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ

"In areas occupied by the enemy, foot and horse guerrilla detachments must be created, as well as groups of saboteurs entrusted with fighting against enemy units with the launching of guerrilla warfare everywhere, with blowing up bridges and roads, with wrecking telephone and telegraphic communications and setting forests, depots and trains on fire."

রুশিয়ার প্রান্তর বিস্তীর্ণ। দুর্গম সীমানা না থাকিলেও আজ যে-পর্যন্ত লাল ফৌজ হটিয়া আসিয়াছে সে স্থানকে তাহারা পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছে। এই দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ এবং ৫০ মাইল, কোথাও বা ১৫০ মাইল প্রশস্ত বিস্তীর্ণ স্থান মরুভূমিতে পরিণত। অশ্বারোহী ও যান্ত্রিক বাহিনীতে তাহার গরিলাদল বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন। সাম্যবাদীর মানবকল্যাণ আদর্শে তাহারা আজ বেপরোয়া ও দুর্ধর্ষ। ইহাতে গরিলা-নীতি যে আজ সে দেশে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাই আমরা অদ্ভুত ও দুঃসাহসিক ঘটনাগুলির খবর একে একে পাইতেছি :

২৯।৭।৪১—জার্মাণ মহড়ার পশ্চাতে একটি গরিলা দল শ্লাক শহর দখল করিয়া নাৎসীদের শেষ করিয়া যত খাবার ও পেট্রোল ছিল তাহা ধ্বংস করে এবং শক্তিশালী নাৎসী-বাহিনী আসিবার পূর্বে পলায়ন করে।

আরেকটি দল লুইসিকে একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়া ৩০ জন নাৎসীকে খতম করে। তিন হাজার টন শস্য ও দুইটি ব্রিজ ধ্বংস করে।

বহুস্থানে রাত্রির অন্ধকারে তাহারা রাস্তার উপর লোহার তার টাঁনা করিয়া রাখিয়া মোটর সাইকেল আরোহীদের শেষ করিয়া দিতেছে। রাস্তার মধ্যে লোহার কাঁটা পুতিয়া মোটর-গুলিকে অকেজো করিয়া তুলিতেছে।

১৪।৮।৪১—একটি গরিলা দল হঠাৎ শুনিল সম্মুখের রেল লাইন দিয়া শীঘ্র একটি নাৎসীসৈন্য-বোঝাই ট্রেণ আসিবে। সময় নাই, মুহূর্তমাঝে গরিলাদের মাথায় মতলব খেলিয়া গেল। সম্মুখের ষ্টেশনে একখানি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ছুটিয়া গিয়া ইঞ্জিনখানি পূর্ণ বেগে আগত নাৎসীসৈন্য-বোঝাই ট্রেণের দিকে চালাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ১৬ খানি গাড়ী অসংখ্য নাৎসীদের লইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

ইহাই গরিলা যুদ্ধ ; ইহাই জনগণের আপন ঘরকে আঘাত করিবার প্রত্যুত্তর ; ইহাই সাম্যবাদী নেতার আহ্বানে জন-গণের ধমনীতে রোমাঞ্চকর শিহরণের অভিব্যক্তি।

(৪)

বাঙলার মাটিতে গরিলা যুদ্ধ

"British Imperialism is now a prisoner in people's camp."

বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে জনগণের দাবিকে অগ্রাহ্য করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই আজ দেখিতেছি, খাস বৃটেনের আত্মরক্ষা করিবার তাগিদে ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের এত ব্যগ্রতা। ভারতের সুপ্ত শক্তি অফুরন্ত। এই ভারত যদি কোনক্রমে শত্রুর হাতে আসিয়া যায়, তবে সুধু এশিয়াখণ্ডে তাহাদের আধিপত্য বিপন্ন হইবে না, খাস বৃটেনের স্বাধীনতাও বিপদগ্রস্ত হইবে। এই সমস্যার মুখোমুখি হইয়া হয়ত ক্রীপস্ বৃটেনের পক্ষ হইতে ভারতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আত্ম-রক্ষার তাগিদে ধীরে ধীরে জনগণের দাবির সম্মুখে নত হইতেছেন। তাহা হইলেও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এখনও তাহাদের পক্ষ হইতে "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"র নীতি চলিবে না, এমন নাও হইতে পারে। যদি সে নীতি গৃহীত হয়, তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার পক্ষে ভারতের জনগণের হাতে একমাত্র অস্ত্র—তৎপরতা (initiative)। ভারতের

জনসাধারণ আপন তৎপরতায় জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য নিজস্ব উপায়ে ও ধারায় কতখানি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে তাহারই উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর "ধরি মাছ না ছুই পানি" নীতির ব্যর্থতা নির্ভর করিবে। ভারতীয় রাজনীতির পট-পরিবর্তন আসন্ন। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতীয় রাজনীতির সার্বভৌম ক্ষমতা কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার সম্মিলিত শক্তি বা যে-কোনো রাজনৈতিক দলের উপর স্থাপিত হউক না কেন, যুদ্ধের রূপ ও গতিকে বদলাইতে হইলে কেবল লালফিতার ফাইল বদলাইলে চলিবে না; তাহা করিতে হইলে আজ জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার সুযোগ দিতে হইবে, দেশের প্রতিটি অধিবাসীর হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিতে হইবে—তোমার দেশ, তোমার সমাজ, তোমার সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য মারো, মারো তোমার শত্রুকে। ট্যাঙ্কের দৃঢ় আবরণে, উড়োজাহাজের বিদ্যুৎগতিতে জাপানীরা আসিতেছে; আসুক। তোমার কটি বন্ধন করিতে হইলে, মাটির মানুষকে আকাশ হইতে মাটিতে নামিতে হইবে, লৌহ-বর্মের দৃঢ় আবরণ ফেলিয়া রক্তমাংসের হাত দিয়া তোমাকে ধরিতে আসিতে হইবে—ইহাই তোমাদের সুযোগ। মারো, একটি ভারতবাসী একটি শত্রুর প্রাণ নিধন করিবে—বাঙলার গৃহে গৃহে ভারতের গ্রামে গ্রামে জনগণকে এই প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকার করিবার সুযোগ এবং এই প্রতিজ্ঞা পালন

করিবার জন্য তাহার হাতে অস্ত্রদানই আজ একমাত্র দাবি ও সমস্যা।

ভারতের জনগণ যদি হাতে অস্ত্র পায় তবে কীভাবে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং স্থায়ী সৈন্যদলের সহিত তাহারা কীভাবে সম্বন্ধ ও যোগাযোগ রাখিবে—সে সমস্যার সমাধান সহজ। কিন্তু মিত্রপক্ষ যদি আজ আমাদের হাতে অস্ত্র না দেয়, তবুও আমরা বাঙলার গ্রামে, বাঙলার ক্ষেতে, বাঙলার পাহাড় ও বনে কীভাবে জাপ-বিরোধী গরিলা সৈন্য-দের গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহাই ভাবিবার কথা। অনেকের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে যে, হয়ত-বা জনযুদ্ধের কথা না তুলিয়া গরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সর্বব্যাপক ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সম্মুখে একদিকে যেমন জনযুদ্ধের প্রধানতম অস্ত্র গরিলাযুদ্ধ, তেমনি অন্যদিকে গরিলা যুদ্ধ জনগণের উপর ভিত্তি না করিয়া, জনগণের আদর্শের প্রতীক না হইয়া, জনগণের সাহায্য, সহানুভূতি, আশ্রয় ও প্রেরণা না পাইয়া দানা বাঁধিতে পারে না। কারণ—(১) প্রথম, গরিলা যুদ্ধের একটি সর্ত হইল, সংখ্যায় ইহারা অসংখ্য হইবে। অলিতে-গলিতে গ্রামে-মাঠে, বনে-পাহাড়ে, পথে-ঘাটে, প্রতি গৃহে-গৃহে ইহাদের ছড়াইয়া থাকিতে হইবে। যেখানে যেভাবে শত্রুকে অসতর্ক অবস্থায় মিলিবে, তখনই তাহাকে আঘাত হানিতে হইবে। স্থায়ী সৈন্যদলের সংখ্যাকে এইভাবে অসংখ্য করা

সম্ভব নয়। (২) দ্বিতীয়, ইহারা রক্তবীজের বংশ হইবে। কোনো এক অখ্যাত স্থানে একটি গরিলা-যোদ্ধা মরিলে, তাহার প্রতিশোধ লইতে যেন সেখানে আরও দশটি জন্মগ্রহণ করে। দেশের দূর কোণে একটি স্থায়ী-সৈন্য মরিলে কেন্দ্রীয় সেনা-পতির আদেশে আর দশটি যোদ্ধা সেখানে আনিবার ব্যবস্থা করিতে গেলে, গরিলা যুদ্ধ সম্ভব নয়। (৩) তৃতীয়, গরিলা যুদ্ধের অন্যতম সর্ত হইল, তৎপরতা। যদি বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রামের গরিলাদের তাহাদের কর্তব্য ও কর্মপন্থার নির্দেশের জন্য সুদূর কলিকাতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে জাপানীদের প্রতিরোধ কখনও সম্ভব হইবে না। (৪) চতুর্থ, কুক্কুট যেমন শিকারী পাখীর ছোঁবল হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার শাবককে আপন কক্ষপুটে আশ্রয় দেয়, তেমনি জাপানী আক্রমণ ও আক্রোশের সম্মুখে দেশের জনগণ যদি তাহাদের যোদ্ধাকে আশ্রয় না দেয়, তবে গরিলাদের দুদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইতে হইবে। জনগণের নিকট হইতে তাহার আশ্রয় চাই, আহার চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেরণা চাই। কিন্তু সেই জনসাধারণ যদি এই যুদ্ধকে আপন যুদ্ধ বলিয়া না মনে করিতে পারে, যদি এই যুদ্ধকে আপন গৃহ, আপন সমাজ, আপন ক্ষেত, আপন লাঙলকে রক্ষা করিবার উপায় বলিয়া না মনে করিতে পারে, তবে সে কিসের আশায়, কিসের তাগিদে এই নির্মম মৃত্যু, ত্যাগ ও ক্ষতিকে বরণ করিয়া লইবে? সেইজন্য গরিলা

যুদ্ধ একমাত্র জন-জাগরণের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা সম্ভব। সেই জন্যই যেমন চীনা যোদ্ধার সাহায্যে ভারতের মাটিতে গরিলা যুদ্ধ সম্ভব নয়, তেমনি কেবল স্থায়ী-সৈন্যের সাহায্যেও কোনো দেশের মাটিতে গরিলা যুদ্ধ সম্ভব নয়।

গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করিবার প্রশ্নের আলোচনায় জাপানী আক্রমণের একটি ছবি মনে রাখিলে সমস্যা সহজ হইয়া আসিবে। জাপানীরা নিশ্চয়ই জল, স্থল ও আকাশ পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে। স্থলের সমস্যা ভারতের পক্ষে সহজ। ব্রহ্মের পরে দুর্গম অরণ্য। দু-একটি পথ যাহা আছে তাহাও বিশাল সৈন্যদলের পক্ষে দুরতিক্রম্য। অতএব আমরা আশা করিতে পারি, ভারতীয় সৈন্য সেখানে শত্রুকে সহজেই বাধা দানে সক্ষম হইবে। কিন্তু ভারতের আকাশ ও সমুদ্রপথ সুবিস্তীর্ণ। কাজেই এই দুই পথে ভারতকে রক্ষা করিতে হইলে শত্রুরা উপকূলে পৌঁছাইবার পূর্বেই পথিমধ্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস রাখিতে পারি, এই পন্থায় ভারতীয় নৌবহর ও বিমানবহর শত্রুকে বাধা দিবার জন্য এতটুকু কসুর করিবেনা এবং সে কার্যে ভারত-বাসীরা সহানুভূতি ও সাহায্যের কার্পণ্য দেখাইবার মতো মূঢ় সাজিবে না। কিন্তু যুদ্ধের তাণ্ডবতায় অঘটন ঘটিতে পারে। জাপানীরা হয়ত কোথাও কোথাও অবতরণ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই গরিলাবাহিনীর পক্ষে শত্রুকে ক্ষত-বিক্ষত ও

বিধ্বস্ত করিবার সুযোগ। ধরুন, যদি বাঙলার মাটিতে জাপানীরা পদার্পন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে কী হইবে? বাঙলাদেশ অতি বিস্তীর্ণ। সিঙ্গাপুর, মালয় বা জাভার মতো ইহা সঙ্কীর্ণ নহে। অন্যান্য যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দিয়া আমরা বলিতে পারি, জাপানীরা কখনও সহসা বাঙলার প্রতি গ্রাম ও প্রান্তরে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা সাধারণত জেলার সহরগুলি ও প্রধান রাস্তা ও রেল-লাইন নিজেদের দখলে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ধরুন, জাপানীরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই অধিকৃত স্থানের মধ্যে এক রেল-লাইন হইতে আরেক রেল-লাইনের এবং এক সহর হইতে অন্য সহরের অন্তর্বর্তী স্থানে বহু গ্রাম ও প্রান্তর অনধ্যুষিত থাকিয়া যাইবে। সেই সময় এই কেন্দ্রগুলিতে ঘাঁটি বাঁধিয়া আমাদের জাপ-বিরোধী গরিলাবাহিনীর জাল সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বভাবতই এই গ্রামগুলিতে যেমন জাপানী শাসন প্রবেশ করিতে বহু সময় লাগিবে, তেমনি এই বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে ভারত সরকারের শাসনও শিথিল হইয়া আসিবে। এমত অবস্থায় আমাদের প্রথম কাজ হইবে:

(১) জাপানীর স্বরূপ, জাপানীর অত্যাচার এবং জাপানীর শঠতা প্রলোভন ও কু-মতলবের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া জন-সাধারণকে সজাগ রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় অধিবাসীর সমর্থনে ও সহযোগিতায় ছোট ছোট গ্রাম্য

শাসনকেন্দ্র স্থষ্টি করিতে হইবে। স্থানীয় খাদ্য সমস্যা ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার ইহাদের হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

(২) কিন্তু নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষার কথা স্থধু ভাবিলে চলিবে না, আমাদের মারমুখো হইয়া জাপানী সৈন্যদের তিলে তিলে ক্ষত-বিক্ষত করিবার সক্রিয় পন্থা চাই। গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া, নাট্যাভিনয় করিয়া, আন্দোলন করিয়া জনগণের গরিলাবাহিনী স্থষ্টি করাই হইবে সেই পন্থা। কিন্তু আমাদের হাতে অস্ত্র কই? গ্রামের দু-একটি পাখীমারা বন্দুকই কি যথেষ্ট? প্রথম দিকে অস্ত্র নাই-বা মিলিল! আমরা জানি বাগেরহাটের লাইন কোন পথ দিয়া গিয়াছে, আমরা জানি চাঁদপুর হইতে গোয়ালন্দ আসিতে হইলে মরা পদ্মার কোন্ চরের কূল দিয়া জাপানী জাহাজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিবে। রাত্রির অন্ধকারে আমাদের দশ জনের এক বাহিনী দেখিলাম, গাড়ী বোঝাই হইয়া জাপানী সম্ভার আসিতেছে। ইঞ্জিনের সম্মুখে বিশাল আলো। সমস্ত লাইন আলোকিত হইয়া পড়িতেছে। বিপদ দেখিয়া অপেক্ষা করিলাম। গাড়ীখানা চলিয়া গেল; চলিয়া যাক্, অনতিবিলম্বে আরেক-খানা আসিবে। সকলে মিলিয়া অন্ধকারে দ্রুত ফিসপ্লেটের লোহাগুলি খুলিয়া রেল-লাইনটি না সরাইয়া তাহার সহিত দীর্ঘ দড়ি বাঁধিয়া ঝোপের আড়ালে বসিয়া রহিলাম। দ্বিতীয় গাড়ী আসিতেছে। জাপানীরা সন্দেহ করিতে পারে নাই।

গাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের আড়াল হইতে দড়ির টান পড়িল ; লাইনচ্যুত হইয়া বোঝাই গাড়ী খণ্ড খণ্ড হইল। ভারতবাসীর বুকে যে-গোলা বিদ্ধ হইবার জন্য সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিতেছিল, তাহারই এক বোঝা ধ্বংস করিলাম। ইহা না হইলে হয়ত-বা আমাদেরই আপনজন, যাহারা হাওড়ার ষ্টেশনে কাজ করিতেছে, তাহাদেরই বুকে এই গোলা জাপানীরা নিক্ষেপ করিত।

ধরুন, মিত্রপক্ষ কিছুদূর পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে। ত্যক্ত স্থলে পথের পার্শ্বে একটি বড় কলেজ প্রাঙ্গণ আছে। জাপানীরা আসিতেছে। মূহূর্ত বিলম্ব না করিয়া কলেজ গৃহ পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিলাম। জাপানীরা পরদিন এখানে আসিয়া মাথা গুঁজিবার স্থান পাইল না। বাঙলার মুষল বৃষ্টিতে জাপানী সৈন্যরা অনাশ্রয়ে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইল। হয়ত যশোহরের যুদ্ধ ইহার ফলে দুইদিন পিছাইয়া গেল। এককথায় অস্ত্র যদি নাও থাকে, আমরা প্রথম হইতেই জাপানীদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিন্ন করিব এবং আশ্রয়স্থল ধ্বংস করিব।

(৩) কিন্তু সুধু এই কার্য করিলেই চলিবে না। অস্ত্র আমাদের জোগাইতে হইবে। ধরুন, জাপানীরা বরিশাল সহর দখল করিয়াছে। স্থানীয় দোকান-পাট সব বন্ধ। দোকানীরা কিছু মাল গ্রামের অভ্যন্তরে লইতে সক্ষম

হইয়াছে। মিত্রপক্ষ সরিয়া যাইবার অনতিবিলম্বে আমরা দুই-একটি গুদাম পোড়াইতে সক্ষম হইয়াছি। একমাস হইল জাপানীরা আসিয়াছে। সহরের মজুত খাদ্য-দ্রব্য নিঃশেষ হইয়াছে। সেনাপতির আদেশে ছোট ছোট জাপানী দল গ্রামের অভ্যন্তরে খাবার সন্ধানে প্রবেশ করিবে। ইহাই আমাদের সুযোগ। আবার হয়ত বর্বর জাপানী সৈন্যের একদল আজ একমাস হইল বরিশালে বসিয়া আছে। নিরামিষ দিন তাহাদের আর কাটে না। রাত্রির অন্ধকারে স্ত্রীলোক সন্ধানে বাহির হইয়াছে। ইহাই আমাদের সুযোগ। ছোট ছোট দলকে হঠাৎ আক্রমণে বিহ্বল করিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা নূতন নহে। রুশের প্রাঙ্গনে, চীনের প্রান্তরে ইহাই আজ দিনের পর দিন ঘটিতেছে।

(৪) এই অস্ত্র সংগ্রহের পর আমরা এক নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিব। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে হয়ত জাপানীরা অনেকখানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। শত্রু সৈন্যের প্রধান দল এখন হয়ত আর আমাদের গ্রামের আশে-পাশে যাতায়াত করে না। সৈন্যের বদলে এখন সেনাপতি মিলিবে। সন্ধান লইলে দেখিব, রেল-লাইনের পাশে-পাশে এক-একটা গ্রামে কোনো বাড়ীতে জাপানীদের সেনাপতি-শিবির বসিয়াছে। রাত নাই, দিন নাই, রক্ষী সৈন্যদল উদ্যত রাইফেল ধরিয়া পাহরায় রত। কিন্তু সৈন্যও মানুষ; একদিন

পর, তুইদিন পর, না হয় দশদিন পর রক্ষীর অলস মন ঝিমাইতে দেখা যাইবেই। ইহাই আমাদের অন্যতম সুযোগ। হঠাৎ আক্রমণে ভীতিগ্রস্ত করিয়া জাপানী সেনাপতিদের বিধ্বংস করিবার পালা চলিবে। আমরা যদি দশজন মরিয়াও একজন সেনাপতিকে মারিতে পারি, তবে বুঝিতে হইবে এক হাজার শত্রু নিধনের সমান কাজ করিয়াছি। এই নীতির ফলে রুশ রণাঙ্গনে আজ জার্মাণ সেনাপতির অভাব ঘটিয়াছে ; সেদিনও জার্মাণীরা জানাইয়াছে, সেনাপতির অভাবে তাহারা তুর্কীস্থান হইতে মিলিটারী এটাচিদের ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

তুই শত বৎসরের পরাধীনতায় ও দাসত্বে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত বাঙালীরা—আমরা ভাবিতেছি, কেন অহেতুক নির্বোধের মতো পূর্ব আকাশের উগ্র দেবতাকে রুষ্ট করিতে যাইব ' পরাধীনই তো ছিলাম, না হয় পরাধীনই থাকিব ! ফাসিস্তদের রূপকে এখনও আমরা চিনি নাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই জাপানী সৈন্যদল চীন, কোরিয়া, ফরমোসার বুকে কী নিদারুণ অত্যাচার চালাইতেছে। আমরা ভুলিয়া যাই, ইহারা চীনের শিশুর মুখের গ্রাসকে কাড়িয়া লইতে এতটুকু দ্বিধা করে নাই, মাতৃস্তন্যকে ছিন্ন করিয়া বর্বর উল্লাসে হাসিতে একটুকু সঙ্কোচ করে নাই। আজ আমরা বাঙালীরা যদি বাঙলার গ্রামে গ্রামে গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করিয়া এই শত্রুকে নিধন করিবার

জন্য আমাদের হাতের যে-কোনো অস্ত্র উদ্যত করিতে পারি, তবে ইহা নিশ্চিত যে, সেই শত্রুরক্তে সিক্ত শাণিত অস্ত্র ভারতের বুকে এক নূতন উৎসাহ সৃষ্টি করিবে। সমস্ত ভারতবাসী আজ বাঙলার নিকট হইতে এই প্রেরণা পাইবার আশায় রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরিলা শিক্ষা

(১)

গরিলা শিক্ষার নীতি

জাপানী বা জার্মাণ রণনীতিকে প্রতিরোধ করিবার একান্ত উপায় হইতেছে, দেশের জনগণকে মুক্তির আহ্বানে সজাগ করিয়া আপন ঘর ও আপন সমাজ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া। সর্বগ্রাসী যুদ্ধকে ঠেকাইতে সর্বসাধারণের সর্ব শক্তিকে সর্বান্তঃকরণে একত্রিত করিয়া আঘাত হানিতে হইবে। এবং সে সংগ্রামে জনগণের পন্থা হইবে গরিলা যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ভারতের জনগণ কী করিয়া এত দ্রুত অস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত হইবে, ইহাই সমস্যা।

"I know that you can learn these things whithin a few days or weeks beacuse I have myself played a considerable part in teaching these things to five hundred Englishmen, Scotch, Welsh and Irish, who within six weeks of the first hundred being grouped together, become one of the best battalions of the International Brigade in Spain...... And a few of those who moved up the line with us, had only ten days' training.—"

—Wintringham.

অর্থাৎ, দেড় মাসের শিক্ষায় ফ্যাসিস্ত শক্তি রুখিবার জন্য শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল গড়িয়া তোলা সম্ভব ; এমন কি মাত্র দশ দিনের

শিক্ষা লইয়াও সম্মুখ রণে শত্রুকে আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া আমরা কেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির লোকেরাও চমকাইয়া উঠিতে পারে। কারণ, তাহারা এযাবৎ তাহাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছে, রণ-বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য কী নিদারুণ পরিশ্রমই-না সৈন্যদলের করিতে হয়। দিনের পর দিন লেফ্‌ট-রাইট করিয়া তাহাদের অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে মাটির উপর বুট ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিঃশেষ করিতে হয়। অথচ কেহ যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, দেখিবেন এই সৈন্যেরা সাধারণ সময়ে প্রতিদিন অকাতরে যে শ্রম ও শক্তি অপচয় করে, বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের তাণ্ডবতায় তাহার এক বিন্দুও কাজে আসে না। প্যারেড (parade) করিবার সময় শিক্ষা দেওয়া হয়, বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে; সম্মুখ রণে তোমার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য মাটির উপর শুইয়া পড়িতে হইবে, বুক ফুলানো তো দূরের কথা মাথাও উঁচু করিবার আদেশ নাই। প্যারেডে শিক্ষা দেওয়া হয়, চলিবার সময় ৩০ ইঞ্চি কদম ফেলিয়া ঋজু রেখায় চলিবে; যুদ্ধের আদেশ—চলিবার সময় যেমন-তেমন ভাবে সোজা পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে। প্যারেডে শিক্ষা দেওয়া হয়, বীরদর্পে হাঁটিবে; যুদ্ধের আদেশ—মাটি কামড়াইয়া বুকে ঘসিয়া অগ্রসর হইবে। প্যারেডে শিক্ষা দেওয়া হয়, সৈন্যদলকে সরল রেখা বজায় রাখিতে হইবে;

যুদ্ধের আদেশ—সর্বসময়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লাইন করিবে। কিন্তু এমন ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার সৃষ্টি হইল কেন? খাস সমর-দপ্তরের বইতে লেখা আছে—

"Drill in close order is of first importance in producing discipline, cohesion and the habits of absolute and instant obedience to the orders of a superior."

অর্থাৎ, মানুষকে মেসিন করিতে হইবে। আদেশ পালন করাকে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি করিয়া তুলিতে হইবে। সে বৃত্তি যেন মৃত্যুভয়কেও ছাড়াইয়া উঠে, ইহাই হইল আসল কথা। এই ড্রিল বা প্যারেড করিবার স্রষ্টা হইলেন ফেডারিক দি গ্রেট। সেই অবধি অন্যান্য সকল দেশ ইহাকে অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। এই পন্থার আবশ্যক হইয়াছিল, কারণ সৈন্যকে যুদ্ধ করিতে হইবে আপন স্বার্থে নয়, অপরের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্যই। যতদিন সৈন্যকে অপরের লাভের জন্য লড়িতে হইবে, ততদিনই এই মাটির উপর বুট ঠুকিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে। তাই সৈন্যের শিক্ষা লইতেও সময় লাগিবে। কিন্তু যেখানে সৈন্যরা বুঝিয়াছে, যে-মাটির উপর তাহার রক্ত ক্ষরিত হইবে সে মাটি তাহারই, সে মাটি একদিন ঘর্মসিক্ত হইয়া যে-ফসল আনিয়াছিল তাহা একান্তরূপে তাহারই জন্য, সে দেশে সৈন্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য মাটির উপর বুক ঠুকিয়া

শ্রম ও শক্তিকে অব্যবহার করিতে হইবে না এবং শত্রুকে রুখিবার জন্য একবার ১৯৪০ সাল, আরেকবার ১৯৪১ সাল, তাহার পর আবার ১৯৪৩ সালকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতে হইবে না। গৃহে ডাকাত পড়িয়াছে। গৃহী যদি জানে যে, গৃহ তাহারই, তবে সে গৃহের অধিবাসীদের আজ্ঞা পালন করিবার উদ্দেশ্যে ডিসিপ্লিন শিখাইবার জন্য মাসের পর মাস সময় অতিবাহিত করিবার অজুহাত দেখাইতে হইবে না। তাহারা আপন তাগিদে একত্রিত হইয়া শত্রুকে আঘাত হানিবে। তাই বলিতেছিলাম, গৃহীকে স্থধু জানিতে দাও যে, গৃহ তাহাদেরই; সে আপন পন্থায় ডাকাত তাড়াইবে।

উইনটিংহাম বর্তমান যুদ্ধের গতি ও নীতি আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

1. Modern war makes imposed, arbitrary and automatic discipline not only useless but harmful, unsuccessful.

2. Modern war makes voluntarily understood and thinking discipline more valuable than ever before.

3. In the British Army's training there is insistence on the discipline outlined in 1 and disregard for those outlined in 2.

অর্থাৎ, যে-শৃঙ্খলা জোর করিয়া সৈন্যদিগকে যন্ত্রসামিল বৃত্তিতে পরিণত করা হয়, তাহা আজ অকেজো; এবং যে-শৃঙ্খলা সৈন্যেরা সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় মানিয়া লয় তাহা শ্লথ হইবার নয়।

বর্তমানে বৃটিশ সমর-নায়কেরা এখনও যান্ত্রিক শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিতে চাহিতেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, জার্মাণ সৈন্যরা কি এ-পর্যন্ত যান্ত্রিক শৃঙ্খলার সাহায্যে কৃতকার্য হয় নাই? যাহারা যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে প্রাধান্য দিয়া আসিতেছিল হিটলার তাহাদের বিরুদ্ধে প্রথম দুই বৎসর জয়ী হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সংঘাতে আসিয়া তিনি বুঝিতেছেন, স্বেচ্ছাকৃত শৃঙ্খলার গ্রন্থি কতখানি দৃঢ় ও অনমনীয়। যান্ত্রিক শৃঙ্খলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখে সোভিয়েট রাশিয়ার মুক্ত জনগণের লালবাহিনী যে প্রথম ধাক্কায় হটিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই; কিন্তু যতই দিন যাইবে ততই এই যন্ত্রমানুষ ও মুক্ত মানুষের প্রভেদ স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। আদর্শপূজারী ধ্যানী মানুষের দৃঢ়তার সম্মুখে আজ্ঞাবাহী খুনী মানুষের জিঘাংসা আপন ধিক্কারে নত হইবে বলিয়া কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না?

সে যাহাই হউক, মোট কথা আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার শিক্ষা দিবার জন্য মাসের পর মাস প্যারেড করাইবার আবশ্যকতা অতি কম। সচেতন জনগণ আপন তাগিদে নেতার আদেশ মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না। কিন্তু শৃঙ্খলার কথা বাদ দিলেও, অস্ত্র-চালনার শিক্ষা যে একান্ত আবশ্যক তাহা

অনস্বীকার্য। কাজ চালাইবার মতো গরিলা যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্র চালনার শিক্ষা ১৫ দিন হইতে এক মাসের মধ্যেই সমাপন করা যাইতে পারে। হয়ত এই শিক্ষার দ্বারা শ্রেষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হওয়া কঠিন, তবু ইহার দ্বারা জনগণ নাৎসী আক্রমণকে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলেও সে আক্রমণের গতিকে বিক্ষত করিতে সক্ষম হইবে। চীনের গরিলাবাহিনী আমাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিয়াছে।

এই শিক্ষা দিবার বিষয়গুলিকে আমরা একের পর এক এই ভাবে সাজাইতে পারি। ইহা প্রথম হইতে পর পর শিক্ষণীয়।

১। কী করিয়া গোলা-গুলীর সম্মুখে আশ্রয় লইতে হয়।

২। কী করিয়া বিভিন্ন অস্ত্রগুলি চালনা করিতে হয়। রাইফেল বা বন্দুক—ইহার দূরত্ব অনুমান এবং তাক্ করিবার পন্থা। হাতবোমা—ইহার প্রয়োগ।

৩। কী করিয়া আড়াল লইয়া অগ্রসর হইতে হয় বা পশ্চাতে হটিতে হয়।

৪। কী করিয়া পরিখা বা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিতে হয়।

৫। ট্যাঙ্ক কী করিয়া ধ্বংস করা সম্ভব।

৬। শত্রুরা সাধারণত কী কী চালে বা চাতুরীতে আমাদের ঠকাইতে পারে ও তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কী কী করিবার আছে।

এই সব শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া আরেকটি কঠিন কর্তব্য আছে। জনগণের গরিলাবাহিনী রাজনৈতিক সৈন্য। দেশের রাজনীতির সহিত ইহাদের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইতে হইবে। স্বাধীনতা পাইলেই বা যুদ্ধে জনগণ তাহার আপন স্বার্থ খুঁজিয়া পাইলেই যে অমনি তাহারা দলে দলে অস্ত্র ধারণ করিতে চাহিবে বা আক্রমণকারীকে নির্ভয়ে প্রতিরোধ করিবে এবং তাহাকে অনাশ্রয়ে মারিতে সাহসী হইবে, তাহা নয়। তাহার জন্য শিক্ষা আবশ্যক, দীক্ষা আবশ্যক। এই শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার প্রধান দায়িত্ব গরিলাবাহিনীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ধরুন, জাপানীরা দক্ষিণ বঙ্গ হইতে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। হয়ত আমাদের পক্ষে দক্ষিণ বঙ্গের কোনো একটি সহরের নিকটবর্তী স্থানে একটি গরিলা দল সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। আমরা বুঝিতেছি, সোজা পাকা রাস্তা ধরিয়া জাপানীরা অগ্রসর হইবার মতলব করিয়াছে। সহরের সম্মুখে জাপানীর সংঘাতে আমরা কিছু অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি। তখন কর্তব্য হইবে, আমাদের এক দলকে ছুটিয়া ঐ পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বস্থিত লোকালয়-গুলিতে একে একে হাজির হইয়া স্থানীয় জনগণকে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া, অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে, কীভাবে জাপানীরা অগ্রসর হইতেছে, কীভাবে তাহারা দেশের জনগণের সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া নির্মম অত্যাচার

করিতেছে এবং আমরা কী করিয়া ইহাদের অগ্রগতিকে মন্থর বা ব্যাহত করিতে পারি। হয়ত ছুটিয়া গিয়া কলিকাতার পথে একটি গ্রামে স্থানীয় বন্দুকগুলি একত্রিত করিয়া গ্রামবাসীদের জাপানীকে রুখিবার জন্য প্রস্তুত করাইতে হইবে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা যাহাতে আবশ্যক হইলে সমস্ত ঝুঁকি লইয়া গরিলাদলকে আশ্রয় ও আহার্য দেয় তাহাও বুঝাইতে হইবে। তাহার পরই আবার ছুটিয়া হয়ত আরও উত্তরে গ্রাম ও সহরতলীতে একই উদ্দেশ্যে পৌঁছাইতে হইবে। চীনা গরিলাবাহিনী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এক অভিনব পন্থা অনুসরণ করিয়াছে। তাহারা কতকগুলি ছোট ছোট নাটক লিখিয়াছে। তাহাতে বর্ণিত আছে, জাপানীরা কীভাবে চীনের নরনারীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে এবং দেশের স্থানে স্থানে জনগণ জাগ্রত হইয়া কীভাবে জাপানীদের জব্দ করিতেছে। সে দেশে গরিলা যোদ্ধাদের প্রায় প্রত্যেককেই নাটক অভিনয় করা শিক্ষা লইতে হয় এবং তাহারা যে রাত্রে যে গ্রামে আশ্রয় লয় সেখানে তাহারা এই নাটক অভিনয় করে। অভিনয় করিবার জন্য বেশভূষা বা ষ্টেজের বিশেষ আবশ্যক হয় না। আমাদের দেশে যেমন সাধারণ যাত্রা অভিনয় হয় ঠিক তেমনি ভাবেই ইহা সম্পন্ন হয়। অজ্ঞ জনগণকে বক্তৃতায় যাহা বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়, নাটক অভিনয়ের দ্বারা তাহা সহজেই বোধগম্য

করানো যায়। আমাদেরও এমনি ধরণের নূতন নূতন পন্থা লইতে হইবে। গরিলাবাহিনীকে একদিকে যেমন অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে দেশবাসীকে জাগ্রত করিবার মন্ত্র গ্রামে গ্রামে ছড়াইবার পদ্ধতিকেও জানিতে হইবে।

(২)

গরিলা-যোদ্ধার হাতিয়ার

"When we feel the sharp military qualities of the Japanese soldiery in contact with our own troops, although very few have yet been engaged, we must remember that China, ill armed or half-armed, has for 4½ years single handed withstood under their glorious leader Gen. Chiang-Kai-shek, the main fury of Japan."

Churchill—28-1-42

সহজ কথায়, জাপানী যুদ্ধের পরাক্রম দেখিয়া চার্চিল আজ বুঝিতেছেন ও দেশবাসীকে বুঝাইতেছেন যে, চীনারা গত সাড়ে-চার বৎসর ধরিয়া ভাঙা বন্দুক লইয়া দুর্ধর্ষ জাপানীর বিরুদ্ধে কী লড়াইটাই-না লড়িয়াছে!

কালের গতিতে যখন তিনি এতই বুঝিলেন তখন আরেকটুকু বেশি বুঝিলে ভালো করিতেন। এই চীনাদের লড়িবার মূল শক্তিটা কোথায়? চীনাদের শক্তির উৎস দুইটি নির্মম ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম, জমি দখল করিলেই দেশ দখলে আনা যায় না; দেশবাসীকেও দখলে আনিতে হইবে। এবং দ্বিতীয়ত, এই দেশবাসীরা গণ্ডীবদ্ধ সহরগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। ফলে, কোনোমতে আধুনিক মারণ-অস্ত্র

কেন্দ্রীভূত করিয়া সহরগুলি করায়ত্তে আনিতে পারিলেই গোটা দেশ ও দেশবাসীকে অধীনে আনা যায় না। শত্রুর পক্ষে আধিপত্য করিবার নাগপাশগুলি ক্রমশ গ্রাম হইতে গ্রামে, এক লোকালয় হইতে আরেক লোকালয় পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে হইবে। একদিকে অসংখ্য জনগণ, আরেক দিকে অপরিমিত-ভাবে বিস্তৃত সেই জনগণ—ইহাই আক্রমণকারী শত্রুর পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু এই জনগণ যে শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া ও মারমুখ হইয়া আপন ঘর ও আপন বাড়ী আগল দিবে, তাহার প্রেরণা জাগাইয়া তোলাই হইল প্রধান সমস্যা। চীনের সর্বজনপ্রিয় নেতা চিয়াংকাইসেক আজ সাম্যবাদী দলের সহিত সুর মিলাইয়া চীনের জনগণকে তাহার গৃহ, তাহার জমি, তাহার দেশকে আপনার বলিয়া চিনিবার সুযোগ দিয়াছেন। আহ্বান জানাইয়া তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন,—তোমাব জিনিষ তুমি রক্ষা করো; যে যেখানে যেভাবে পারো গরিলা নীতিতে শত্রুবাহিনীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোমার দেশের স্থায়ী সৈন্যদলকে জয়ী হইবার জন্য সাহায্য করো। ইহাই হইল দুর্জয় চীনা শক্তির মূল মন্ত্র।

বাস্তবক্ষেত্রে এই শক্তির প্রতিক্রিয়া দেখিয়া, বৃটিশ শাসকবর্গ ইহাকে সমীহ করিতে শুরু করিয়াছেন এবং আজ জাপানীর আক্রমণকে রুখিবার জন্য চীনা গরিলাবাহিনীকে

সাদর আহ্বানে ব্রহ্মদেশে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। গরিলা-যুদ্ধের দ্বারাই যদি জাপানীকে রুখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে স্থানীয় জনগণের অভ্যন্তর হইতেই সে বাহিনী সৃষ্টি করা শ্রেয়। কারণ একদিকে যেমন বিদেশী বাহিনীর পক্ষে এই দেশের পাহাড় ও প্রান্তরে, নদ ও নদীতে, গ্রাম ও সহরে গরিলা-যুদ্ধ চালানো সম্ভব নহে, তেমনি অন্যদিকে যে জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া গরিলা-বাহিনী দিনের পর দিন ঘাত-প্রতিঘাতে শত্রুকে পঙ্গু করিয়া তুলিবে, তাহার সহিত গরিলাবাহিনীর একান্ত যোগাযোগ আবশ্যক। সেইজন্য আজ প্রয়োজন, চীনের নিকট হইতে গরিলাবাহিনী ধার করিয়া আনা নহে, প্রয়োজন হইতেছে, এই দেশের জনগণের হাতে নির্ভয়ে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া।

কিন্তু এই অস্ত্র কোথায় মিলিবে—এই প্রশ্নই অনেককে নিরুৎসাহিত করিয়াছে। অস্ত্রের আলোচনার পূর্বে গরিলা-যুদ্ধের রণনীতি (strategy) এবং রণকৌশলের (tactics) কথা মনে রাখা দরকার। কারণ ইহার উপরই অস্ত্রের আকার ও তাহার ন্যূনতম পরিমাণ নির্ভর করিতেছে।

"From the point of strategy this war as a whole should be prolonged but individual battles should be short and decisive"—Peng Teh-hwai—(চীনের একজন বিশিষ্ট গরিলা নেতা)

অর্থাৎ, লক্ষ্য থাকিবে যে, গোটা যুদ্ধটা যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী

হয়, কিন্তু খণ্ড খণ্ড যুদ্ধগুলি স্বল্পস্থায়ী হইবে। কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যদি আক্রমণকারীকে আমাদের দেশে চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া দিনের পর দিন অতর্কিত আঘাতের আতঙ্কে থাকিতে হয়, তবে তাহারা ধীরে ধীরে যুদ্ধের স্পৃহা হারাইতে বাধ্য। তাহা ছাড়াও যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে ততই তাহাদের আহার ও রসদকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করিবার সুযোগ মিলিবে।

ইহাদের রণকৌশলের (tactics) মূল সূত্র দুইটি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে--

(1) "Tactics should be tip and run ; not pushes but strokes."

(2) "It should not seek for his weakness, but for his materials."

অর্থাৎ, ছোঁ মারিবার মতো কোনো স্থানে তীব্রবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এলোপাথাড়ি আঘাত করিয়া আবার পর-মূহূর্তে তীব্র-বেগে উধাও হইতে হইবে। এবং শত্রুর শক্তিকে সম্মুখরণে মারিবার চেষ্টা না করিয়া শত্রুর রসদ ও আহার ধ্বংস করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করিয়া মারাই হইবে গরিলাবাহিনীর কৌশল।

গরিলা-যুদ্ধের এই নীতি ও কৌশলের সূত্র স্মরণ রাখিলে একটা কথা সহজে বুঝা যায় যে ইহাদের জন্য জমকালো ভারী অথবা সূক্ষ্ম যন্ত্রের বিশেষ কোনো আবশ্যক নাই। প্রথমে ধরা যাক রাইফেলের কথা। দেশ বিদেশে—এমন কি আমাদের

দেশেও অনেক কারখানা আছে, যেখানে পুরানো আমলের রাইফেল তৈরি করা সম্ভব। আমেরিকা বা ইংলণ্ডে অনেক কারখানা আছে যেখানে বরাবর বহু রাইফেল প্রস্তুত হয়। কিন্তু সেগুলি একই ধরণের বা একই মাপের নয় বলিয়া সৈন্যদলে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। সেগুলি জনগণের হাতে তুলিয়া দিলে অনেক কাজে আসিবে। জনগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধা অবশ্য 'টমিগান'। এগুলি ছোট মেসিনগানের মতো। জাপানী বা জার্মাণীর সুষ্ঠু মেসিনগানের সহিত সম্মুখ-রণে এগুলি অব্যবহার্য, সত্য; কিন্তু ইহার সাহায্যে গরিলা-যোদ্ধারা পশ্চাৎ হইতে শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পালাইয়া যাইবার কার্য সহজেই হাসিল করিতে পারে। আমেরিকার আধুনিক ডাকাতের দল এই "টমিগান" ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা খুব হাল্কা ও সূক্ষ্ম কারুকার্য বর্জিত। এইবার হল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার সময় জার্মাণ প্যারাসুট সৈন্যরা এই অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ইচ্ছা করিলে আমেরিকা হইতে নিশ্চয়ই এই অস্ত্র নূতন ও পুরাতন মিলাইয়া হাজারে হাজারে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

গরিলা-যোদ্ধার পক্ষে দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হাত-বোমা (Hand-grenade)। চলন্ত যান-বাহনকে ধ্বংস করিবার পক্ষে এমন উপযুক্ত অস্ত্র আর নাই এবং বর্তমান যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হইল যন্ত্রচালিত যান-বাহন ও অস্ত্র। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী,

মোটর, মোটর সাইকেল, লরী, রেলগাড়ী—ইহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হয়। সেইজন্য এই যান্ত্রিক যানগুলিকে ধ্বংস করিয়া শত্রুর গতি অচল করিয়া দিবার পক্ষে হাত-বোমাই প্রধান অস্ত্র। একটি যোদ্ধা একটি হাত-বোমার দ্বারা যদি শত্রুর একটি ট্যাঙ্ক বা লরিকে চূর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলে সে হয়ত এক মুহূর্তে হাজার লোকের দশদিনের পরিশ্রম নষ্ট করিয়া ফেলিল। শত্রুকে তিলে তিলে মারিবার পক্ষে ইহা ছাড়া আর কী শ্রেষ্ঠ অস্ত্র থাকিতে পারে ? অথচ এই হাত-বোমা তৈরি করা অতি সহজ। যে-কোনো কারখানায় ইহা হাজারে হাজারে প্রস্তুত হইতে পারে। কারখানা ছাড়াও দেশের জনগণ স্বহস্তে টিনের কৌটায় বা অমনি কোনো ধাতব পদার্থে তৈরি কৌটায় মাল-মশলা পুরিয়া ছোট ছোট হাত-বোমা বানাইতে পারে। হয়ত সেই হাত-বোমায় ট্যাঙ্ক বা বড় সাঁজোয়া গাড়ী ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না; কিন্তু একখানা খাদ্যসম্ভারপূর্ণ লরীও তো চূর্ণ হইতে পারে, এবং সেই খাদ্যের অভাবে হয় তো বহু শত্রুসৈন্য অনাহারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে। বড় হাত-বোমা যদি নাই মেলে তবে ছোট হাত-বোমার সাহায্যে শত্রুকে অনাহারে মারিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কী ? দেশের জনগণ বোমা তৈরি করিতে গেলে হয়ত অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু যখন লিবিয়া, রাশিয়া এবং ব্রহ্মদেশের প্রান্তরে হাজার হাজার লোক অকাতরে প্রাণ দিতেছে তখন

দেশের অভ্যন্তরে নাৎসী শত্রুকে মারিতে গিয়া দুই-একজন না-হয় দুর্ঘটনায় মরিল, তাহাতে ভয় পাইবার কী আছে? শুনিয়াছি বাঙলাদেশে এক সময় সন্ত্রাসবাদী দল এইরূপ বোমা বানাইয়া তাহাদের কাজ হাসিল করিবাব চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য সে দল আজ লুপ্ত। তবুও ইহা প্রমাণ করিতেছে যে, সরকারের আদেশ ও উৎসাহ মিলিলে ভারতের জনগণও স্বহস্তে হাত-বোমা তৈরি করিয়া জাপ আক্রমণকে রুখিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিতে পারে। আজ চীনের গরিলাবাহিনী দলে দলে পিঠের উপর এক বস্তা হাত-বোমা ও হাতে ছোট তলোয়ার লইয়া মিত্রপক্ষকে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। আমরা কেন আমাদের পরম শত্রু জাপানকে রুখিবার জন্য এই অস্ত্রেও সজ্জিত হইবার অধিকার পাইব না?

তৃতীয়ত, শিকারী-বন্দুক। সময় মতো ইহার সাহায্যও কম নহে। ১২নং বন্দুকের অভাব আমাদের দেশে নাই। বহু শিকারী ও বড়লোকের গৃহে ইহার সন্ধান মিলিবে। প্রশ্ন হইতেছে টোটার। ছর্‌রা টোটার সাহায্যে শত্রুকে তো ঠেকানো যাইবে না। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে নানা উপায়ে এই ছর্‌রা টোটাকে বুলেটে পরিণত করিতে পারি। ইহা করিবার সহজ পন্থাগুলি হইতেছে—(ক) টোটার পশ্চাৎ খুলিয়া ফেলিয়া ছর্‌রাগুলি লইয়া একত্রে গলাইয়া আবার পূরিয়া দিতে পারি এবং পূরিবার পূর্বে সম্ভবমতো আরও কিছু বারুদ দিলে

গুলীর বেগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা ৫০ গজ বা তাহার বেশি দূর পর্যন্ত শত্রুকে রুখা যাইতে পারে। (খ) আমাদের দেশের শিকারীরা বাঘ বা কুমীরকে মারিবার পূর্বে একটা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। টোটার সম্মুখের ছর্‌রা খুলিয়া ফেলিয়া মাছ মারিবাব জালের কাঠি ভরিয়া দেয়। এইরূপ একটি গুলীর আঘাত বাঘ বা কুমীরের পক্ষে সহ্য করা দায়। এই পন্থাও অনুকরণীয়। (গ) ছররাগুলি খুলিয়া একত্রে মোমের আঠা দিয়া জোড়া লাগাইয়া আবার স্বস্থানে প্রবেশ করাইয়া কাজ হাসিল কবা যাইতে পারে। ইহাতে ছররাগুলি নল হইতে বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে না। একটি স্থানে একত্রিত হইয়া প্রবেশ করে। ইহা করিবার সময় ছর্‌রা-গুলির সংখ্যা কিছু কমাইতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে মোমের আঠার সাথে একত্রিত হইয়া বন্দুকের নলের মধ্যে জমিয়া যাইতে পারে। (ঘ) আরেকটি পন্থা হইতেছে, টোটাগুলির মধ্যে ঠিক যেখানে বারুদ ও ছর্‌রা মিশিয়াছে সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়া কার্ড বোর্ড কাটিয়া দুই ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে, গুলী করিলে এই গোটা কার্ডবোর্ড ও ছররাগুলি একত্রিত হইয়া শত্রুর দেহে একটি বিন্দুতেই আঘাত করিবে।

কিন্তু গরিলাদল সুধু এই সকল অস্ত্রের উপর কখনই একান্তভাবে নির্ভরশীল নহে। তাহার মূলমন্ত্র হইল, শত্রুর

অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া শত্রুকে মারিব। শত্রুর আহার কাড়িয়া লইয়া শত্রুকে অনাহারে রাখিয়া নিজে পুষ্ট হইব। সেইজন্য গরিলাদলের সাহায্যে শত্রুকে দিনের পর দিন দুর্বল করা এত সহজ। তুর্কী-বেদুইন যুদ্ধে অন্যতম গরিলা-যোদ্ধা লরেন্সের অনুরূপ নীতিতে অনেক বড় বড় সেনাপতিদের প্রথমে হাস্যোদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি কার্যক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্যের আহার নষ্ট করিয়া, অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তুর্কীদেরই নির্মূল করিতে লাগিলেন, তখন সেনাপতি এলেন্‌বি স্বেচ্ছায় লরেন্সকে সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। চীনা গরিলাবাহিনীতেও আমরা ঐ একই নীতি অনুসরণ করিতে দেখিতেছি—

"Chiang-Kai-shek confirmed the view that the guerillas are perfectly prepared to operate without any fixed base, depending entirely on the enemy for renewing their supplies of arms and ammunition." —J. G. Anderson. (China fights for the world)

মোট কথা, গরিলা-যুদ্ধ চালাইবার জন্য সমস্যা—অস্ত্রের নহে, অস্ত্রের সংগ্রহও নহে। সমস্যা হইতেছে, জনগণকে নূতন আশার বাণী, মুক্তির বাণী দিয়া নাৎসী আক্রমণকে রুখিবার জন্য আহ্বান। জনগণ যদি জানে যে, এই যুদ্ধ তাহারই একান্ত আপন ঘর, আপন দেশ, আপন সমাজ রক্ষা করিবার জন্য, তাহা হইলে তাহার বাধা দেওয়ার শক্তিকে কে অতিক্রম করিবে ?

(৩)

আড়াল লইবার ও হাত-বোমা ছুঁড়িবার কায়দা

আমাদের মতো যুদ্ধবিদ্যায় আনাড়ী ও অনভিজ্ঞদের গরিলা যুদ্ধ হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে হইলে ইহার মোট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে গোড়া হইতেই বার বার করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। সাধারণ যুদ্ধে শত্রুর সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পশ্চাৎ বা পার্শ্ব হইতে ঘেরাও করিয়া মারাই হইল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু গরিলা যুদ্ধে ঠিক ইহার বিপরীত নীতি অনুসরণ করিতে হয়। শত্রু যেখানে দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন, সেইখানেই গরিলা-যোদ্ধাদের আঘাত হানিতে হইবে। তাহাও আবার একচোটে বা এক ঢিলে মারিবার চেষ্টায় যেমন হইবে না, তেমনই তাহার পক্ষে উহা করাও সম্ভব নহে। শত্রুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুর্বল বিন্দুতে তিলে তিলে, দিনের পর দিন আঘাত করিয়া তাহাদের ঘায়েল করিতে হইবে। জড়োকরা জাল হইতে মাছের পক্ষে ছিঁড়িয়া বাহির হওয়া দুষ্কর, কিন্তু নিয়তির পরিহাস এই যে, মাছ ধরিতে হইলে জালকে বিস্তৃত করিয়াই ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ইহাই

জালকে ছিন্ন করিবার সুযোগ। আজ জাপান যখন আসাম বা বাঙলার সড়ক দিয়া ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি অস্ত্র ও বর্মে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, তখন গরিলাবাহিনী নির্বোধের মতো কখনই তাহাকে খোঁচা মারিতে যাইবে না। শত্রু আসিতেছে, আসিতে দাও; কিন্তু এই সজ্জিত ও সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যদলকে পর মুহূর্তেই আহার ও রসদ জোগাইবার জন্য গাড়ীর পর গাড়ী বা লরীর পর লরী পাঠাইতে হইবে। ইহাই গরিলাদলের সুযোগ ও শুভ মূহূর্ত। যে-পথ ধরিয়া জাপানীরা আসিতেছে, তাহার পার্শ্বে একটি গ্রামে একদল গরিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। হয়ত গরিলাদল কোনো দরিদ্র কুঁড়ে ঘরে বসিয়া দিনান্তে খাইতে বসিয়াছে। হঠাৎ একটি কৃষকের মেয়ে আসিয়া খবর দিল জাপানীদের দুইখানা লরী রাস্তার মোড় দিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। আহার হইল না। গরিলা দল আরেক সোজা পথ দিয়া সম্মুখের এক মোড়ে লরীর সন্ধানে চলিল। মূহূর্ত মাঝে হাজির হইয়া দেখিল মোড়ের নিকটেই একটি ঝোপ এবং তাহারই পাশে একটি কবরের মাটি এখনও উঁচু হইয়া আছে। অবসর নাই, কবরের আশ্রয়ে মাথা নীচু করিয়া হাত-বোমা বাহির করিল; সঙ্গে সঙ্গেই সেই হাত-বোমার আঘাতে শত্রুর লরী অচল হইল। রসদ ও খাদ্য-সম্ভার ধূলায় লুণ্ঠিত, কিন্তু আর অস্ত্র নাই; গরিলাদল

পলাইল। রাত্রির অন্ধকারে সেই লরীই শুধু মারা পড়িল না, সে মরিয়া রাত্রের মতো আরও অনেক লরীর পথ আটকাইয়া রহিল। পরদিন প্রাতে জাপানী সেনাপতি হাজির। নির্মম শাস্তি দিবার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামে একদল জাপানী সৈন্য মোতায়েন হইল। শত্রুর সংহত শক্তি এইভাবে গ্রামের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিবে। ইহাই গরিলাবাহিনীর দ্বিতীয় সুযোগ। গ্রামের এক বড়লোকের বাড়ী জাপানীরা অধিকার করিয়াছে। সেখানে বসিয়া সেনাপতি ও তাঁহার সাঙ্গ-পাঙ্গ তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। দু-একদিন কাটিল। সন্ধ্যা নামিয়াছে। জাপানী সৈন্যরা সন্ধ্যার অন্ধকারে স্ত্রীলোক সন্ধানে বাহির হইয়াছে। সেনাপতি গৃহে তাহারই অপেক্ষায়। স্ত্রীলোক বেশে কাহারা যেন আসিতেছে, সেনাপতি উৎফুল্ল। মুহূর্ত মাঝে গরিলাদল আপন মূর্তি ধারণ করিয়া সেনাপতি ও অনুচরদের নিঃশেষ করিল। জাপানী-অস্ত্র গরিলার হাতে আসিল। ইহাই গরিলা যুদ্ধ ; ইহাই জনগণের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ করিবার জন্য হাতে-কলমে যাহা একান্তভাবে শিক্ষা করা আবশ্যক আমরা তাহারই আলোচনা একে একে করিব। সর্বপ্রথম আমাদের জানিতে হইবে, কী করিয়া গোলাগুলীর সম্মুখে আড়াল লইতে হয়। ভাড়াটিয়া সৈন্যের নিকট ইহার জরুরী আবশ্যকতা লইয়া বিশেষ বলিতে হয় না। কারণ তাহারা মুখে যাহাই বলুক, অন্তরে তাহাদের প্রাণের

মায়া অত্যন্ত প্রবল ; কিন্তু যাহারা আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপন ঘর ও সমাজ রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তাহাদের কাছে প্রাণের মূল্য অতি কম, আদর্শই তাহাদের কাছে বড় কথা। ফলে তাহারা আড়াল লইতে অবহেলা করিয়া নিরর্থক কাতারে কাতারে মূল্যবান জীবন বলি দিয়া বসে। তাহারা ভুলিয়া যায় আপন মৃত্যু তাহাদের লক্ষ্য নয়, শত্রুর মৃত্যুই তাহাদের কাম্য। সেইজন্য তাহাদের বারবার আড়াল লইবার কথা বলিয়া দিতে হইবে।

আড়াল লইবার প্রথম পদ্ধতি—(১) গুলী ও হাত-বোমা ছুঁড়িবার সময় অবশ্য শুইয়া পড়িতে হইবে। যাহারা পাখী শিকার করিয়া থাকে তাহারা জানে যে, পাখী যখন গাছের উপর থাকে তখন লক্ষ্য করা সহজ, কিন্তু মাটির উপর বসা পাখীকে গুলীবিদ্ধ করা কঠিন। ঠিক সেই কারণেই দণ্ডায়মান মানুষকে শায়িত মানুষ অপেক্ষা আঘাত করা সহজ। ইহা ভিন্ন দাঁড়াইয়া থাকিলে শত্রু প্রশস্ত লক্ষ্যবস্তু পাইবে। কী ভাবে শুইয়া পড়িতে হয়, পরপৃষ্ঠায় ছবি দেখিলে বুঝা যাইবে। বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, পা দুখানি আবশ্যক মত ফাঁক করিয়া এবং হাটু ভাঙিয়া গোড়ালি দুটিকে মাটির সহিত স্পর্শ করাইতে হইবে। শুইবার সময় সম্মুখে মাথার নিকট যে-কোনো প্রকার একটি আড়াল দেওয়ার বস্তু থাকা চাই। এমন কি যদি সামান্য একখানি ইটও থাকে,

তবে তাহা শত্রুর অনেক গুলীর হাত হইতে রক্ষা করিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে সৈন্যরা আড়াল দিবার অন্য কিছু না পাইলে মৃত সৈন্যের খণ্ডিত দেহ বা কাটা পা টানিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কোনো মাঠ সাধারণত
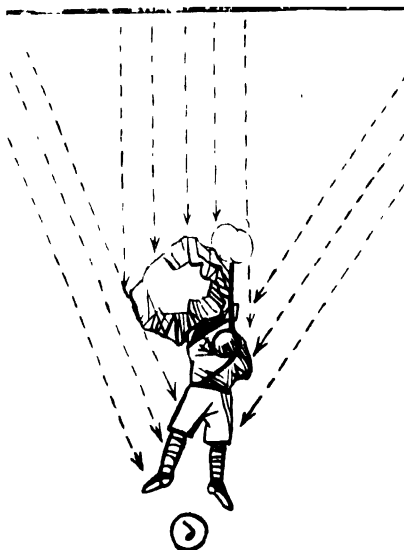
শুইয়া পড়িবার কায়দা

পুরাপুরি সমান থাকেনা; একটু ঢালু বা উঁচু-নিচু থাকেই। অন্য কিছু না মিলিলে এই ঢালুর আড়াল দিয়া অন্ততঃ শুইয়া পড়িতে হইবে। গরিলাদলকে গ্রামের কোনো এক মাঠে লইয়া গিয়া প্রথমে এই আড়াল লইবার কায়দা শিখাইতে হইবে।

শুইয়া আশ্রয় লইবার সময় আরেকটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহারা যেন কখনও কোনো স্বল্পপরিসর স্থানে জড় হইতে চেষ্টা না করে; যতদূর সম্ভব তাহারা ছড়াইয়া পড়িবে, তবে যেন তাহারা সকলেই তাহাদের কম্যাণ্ডারের আদেশ শুনিতে বা ইঙ্গিত দেখিতে পায়। অন্যথায় তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

(২) আড়াল লইবার দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ পন্থা, মাটি কাটিয়া পরিখা তৈরি করা। বাঙলার মাটি অতি নরম, সে জন্য এদেশে পরিখা কাটা অতি সহজ। তবে বর্ষার আগমনে আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ বঙ্গে পরিখা কাটিয়া আশ্রয় লওয়া দায়। জল ও কাদায় মিলিয়া এগুলিকে অকেজো করিয়া তুলিবে। যে পরিখাগুলি অল্প সময়ের জন্য আবশ্যক, সেগুলি দুই হাত চওড়া এবং এক হাত গর্ত করিয়া কাটিলেই চলিবে। যেগুলিকে কায়েমী করিয়া গড়িতে হইবে, সেগুলির গর্ত দুই হাত করিলেই চলিবে। পরিখা কাটিবার সময় দুইটি কথা মনে রাখা দরকার; প্রথম, পরিখাগুলি ৩।৪ হাত অন্তর আঁকা-বাঁকা করিতে হইবে। যাহাতে ইহার কোনো একস্থানে গোলা পড়িলে তাহা বাঁকের অন্য পার্শ্বে পরিখাস্থিত সৈন্যকে আহত করিতে না পারে। দ্বিতীয়ত, পরিখা কাটিয়া যে-মাটি বাহির হইবে, তাহা শত্রুর আক্রমণের দিকে বরাবর জড় করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে আড়াল লইবার জন্য

অধিক উঁচু স্থান মিলিবে। বাঙলার মাটিতে এই পরিখা কাটিতে বিশেষ কোনো নূতন অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। দেশী কোদাল মিলিলেই যথেষ্ট। বাঙালীদের এই পরিখা কাটিবার জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় নাই। কোদাল ধরিতে জানিলেই চলিবে। তবে একটা জিনিষ জানা দরকার ; গরিলা যুদ্ধের মধ্যে এমন সময় আসে যখন তাহাদের হঠাৎ সরিয়া পড়া অসুবিধা। হয়ত সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিখায় দাঁড়াইয়া শত্রুর সহিত গুলী চালাইয়া যাইতে হইবে। এমন সময় শত্রুপক্ষ যদি প্রচুর গোলা ফেলিতে থাকে তবে তাহাকে পরিখার মধ্যে বসিয়াই শৃগাল গর্ত কাটিতে হইতে পারে। ইহার অর্থ, পরিখার দেওয়ালে ছোট অস্ত্র দিয়া গর্ত কাটিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই গর্ত কাটিতে পূর্ব হইতে অভ্যস্ত হওয়া ভালো।

একটা কথা আমরা বলিয়াছি, বাঙলার মাটিতে পরিখার কার্যকারিতা কম। ইহা যেমন কম, তেমনি অন্যান্য অনেক ঘটনার বা প্রাকৃতিক সুবিধাও আমাদের আছে। আমাদের দেশ বর্ষাপ্রধান বলিয়া সাধারণত রেল-লাইন ও রাস্তাঘাটগুলি অনেক উঁচু। স্থানে স্থানে রাস্তা ও রেল-লাইন আড়াল লইবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের কৃষি-জমি খণ্ড-খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন। এই সীমাগুলি নির্দেশ করিবার জন্য বাঙলার মাঠে মাঠে 'আলের' অভাব নাই। মাঠের ভিতর দিয়া চলিবার সময় যদি হঠাৎ গুলী

করিতে হয়, তবে এই আল ভালো আশ্রয় দিবে। ইহা ছাড়া দক্ষিণবঙ্গে ভেড়ী বা বাঁধ নামে সু-উচ্চ ও দীর্ঘ মাটির দেওয়াল নদীর পাশে পাশে সযত্নে রক্ষিত হয়। এমন সুন্দর আশ্রয় অন্য দেশে মেলা দায়। দক্ষিণবঙ্গে বরিশাল, খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলাতে জাপানীরা যখন ছোট ছোট ষ্টীমার বা লঞ্চে করিয়া দেশের অভ্যন্তরে আধিপত্য করিবার চেষ্টা করিবে, তখন এই ভেড়ীর আড়াল হইতে গুলী ও হাত-বোমা ছুঁড়িয়া তাহাদের ঘায়েল করিতে সময় লাগিবে না। যাঁহারা বাঙলার গ্রামের সহিত পরিচিত তাঁহারা দেখিবেন, নদীর পার্শ্বে অল্পদূর অন্তর হাট ও বাজার বসে। এই হাটগুলির নিকটে নদীর তীরে অধিকাংশ সময় নৌকাগুলি মাটির উপর পড়িয়া থাকে। নদীর বুকের উপর শত্রুকে আক্রমণ করিবার পক্ষে নৌকাগুলির পশ্চাতে শ্রেষ্ঠ আড়াল মিলিবে। আরেকটি কথা জানিয়া রাখা ভালো, আমাদের দেশে দীর্ঘ মাঠের মাঝে মাঝে ঝোপ আছে। গরিলারা যেন ভুল করিয়াও কখনো ইহাকে আশ্রয় না মনে করে। কারণ, ঝোপ কখনও গুলীকে ঠেকাইতে পারে না; অধিকন্তু শত্রুরা যদি একবার জানিতে পায় যে, ইহার পশ্চাতে গরিলারা আছে, তবে তাহাদের পক্ষে দূর হইতে এই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে ঝোপকে লক্ষ্য করা অতি সহজ হইবে।

ইহার পর শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, হাত-বোমা চালনা।

ট্যাঙ্ক, লরী, সৈন্যদল প্রভৃতি ধ্বংস করিবার এমন সুন্দর অস্ত্র আর নাই। ইহার সাহায্যে শত্রুর ক্ষতি করা অতি সহজ, তবে সৈন্যের ব্যক্তিগত জীবন বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে। একবার যদি জনগণের গরিলাদল মরিয়া হইতে পারে, তবে এই অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা স্থায়ী-সৈন্য অপেক্ষা অধিক কার্যকরী ভাবে শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে। ছোট হাত-বোমা সাধারণত সিগারেটের কৌটার মতো হয়। ইহার আকার ও ওজন বিভিন্ন প্রকার আছে। ছোটগুলি একাপোয়া এবং ট্যাঙ্ক থামাইবার উপযুক্ত বড় হাত-বোমাগুলি তিন সের পর্যন্ত হয়।

এই অস্ত্রে শিক্ষিত হইতে হইলে প্রথম আবশ্যক, (১) দূরত্ব অনুমান করিতে পারা। সাধারণত হাত-বোমাকে ২৪ হাত হইতে ৬০ হাত পর্যন্ত ছুঁড়িতে হয়। চকিতে লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করিতে মুহূর্ত মাঝে এই দূরত্ব অনুমান করা চাই। ইহার জন্য বিভিন্ন বস্তুকে দেখাইয়া গরিলাদের দূরত্ব অনুমান করাইতে শিক্ষা দিতে হইবে। একটি রাস্তা দেখিয়াই যেন তাহারা অনুমান করিতে পারে, ইহা কতখানি চওড়া। প্রথম প্রথম ভুল হইলেও অভ্যাসে সঠিক ধারণা জন্মিবে। এই অনুমানের উপর হাত-বোমার কার্যকারিতা নির্ভর করিতেছে। (২) ইহার পর ছুঁড়িবার পদ্ধতি জানা চাই। ইহা শিখিবার জন্য আমাদের এখনই কোনো হাত-বোমার আবশ্যক নাই।

একখানি একপোয়া ওজনের ইট বা পাথর লইয়া অভ্যাস করিলেই চলিবে। এই ইট লইয়া বিভিন্ন প্রকার দূরত্বে লক্ষ্য-বস্তুকে আঘাত করিতে শিখিবার পর অধিক ওজনের ইট লইয়া শিখিতে হইবে। হাত-বোমাকে কখনও মাটির উপর গড়াইয়া বা সোজাভাবে ছুঁড়িতে নাই। ইহাকে উপরদিকে উঁচু করিয়া (৪৫ ডিগ্রি) চালিতে হইবে; যেন দূরে মাঠের মধ্যে একটা দুইহাত চওড়া গর্ত আছে এবং সেই গর্তের ভিতরে আমাদের বোমাটিকে ফেলিতে হইবে। এই চালনা দুই প্রকারে সম্ভব। হয় হাতকে নীচুর দিকে ঝুলাইয়া, অথবা গোটা হাতকে পিছন হইতে কাৎ হইয়া কাঁধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া সম্মুখে ঝাঁকি দিয়া। হাতকে নীচে ঝুলাইয়া ছুঁড়িতে হইলে মাটির উপর খাড়াই দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু শত্রুর সম্মুখে ইহা সম্ভব নয়। আড়াল হইতে বা পরিখা হইতে দাঁড়াইয়া অথবা হাঁটু গাড়িয়া ছুঁড়িতে হইলে গোটা হাতকে উপর দিয়া ঘুরাইয়া ফেলাই একমাত্র পন্থা। অতএব ইহাই প্রথম শিক্ষণীয়। কী ভাবে ছুঁড়িতে হইবে, তাহা ছবিগুলি পর পর দেখিলে বুঝা যাইবে। প্রথমে দক্ষিণ হাত সোজা এবং চিৎ করিয়া বোমা ধরিতে হইবে। সেই সাথে পা দুখানি তফাৎ রাখিয়া দক্ষিণ পায়ের উপর শরীর-ওজন রাখিতে হইবে। বাম পায়ের পাতা সাধারণত লক্ষ্যবস্তুর দিকে প্রসারিত থাকিবে এবং বাম হাত-খানি দেহের সমতা ঠিক রাখিবার জন্য সোজা সম্মুখে উঁচু হইয়া

আড়াল লইবার ও হাত-বোমা ছুঁড়িবার কায়দা
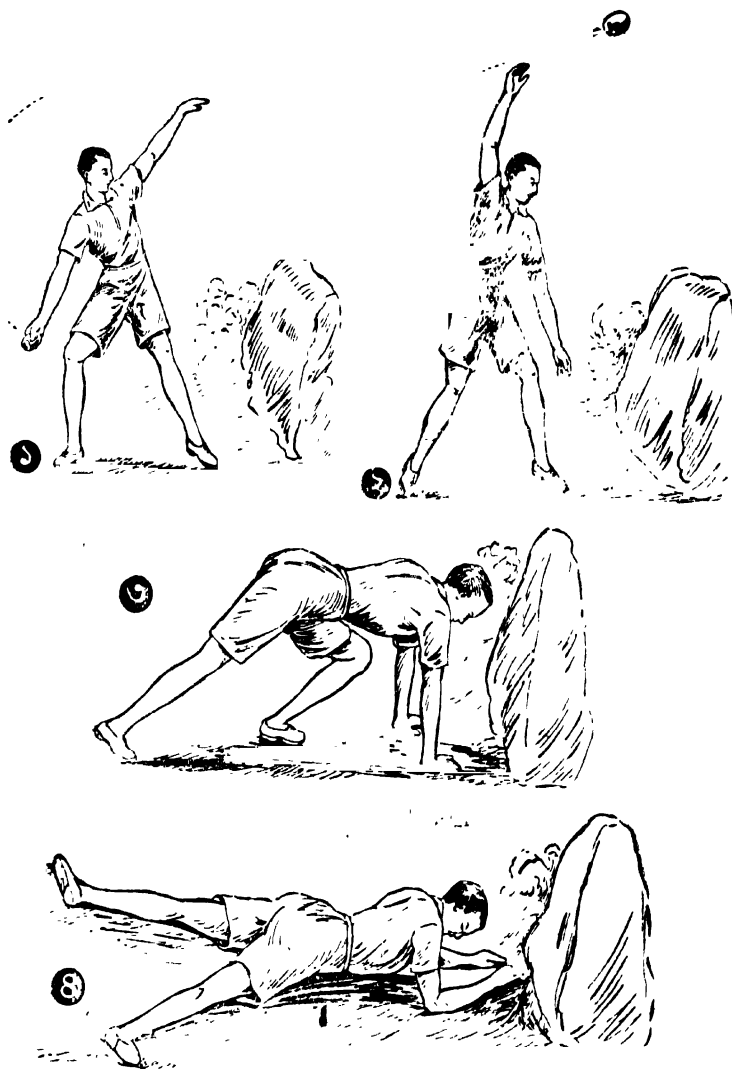
উঠিবে। ইহার পর ছুঁড়িবার সময় সমস্ত ওজন বাম পায়ের উপর গিয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দেহ বাঁকিয়া ডান হাত উপরে এবং বাম হাত নীচুতে যাইবে। নিকটস্থ গ্রামে বা সহরে যে ভালো ক্রিকেট বল করিতে পারে তাহার নিকটে ইহা সহজে শিখিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে মনে থাকে যেন, হাত-বোমা ক্রিকেট বলের মতো অত সোজাভাবে যাইবে না। উঁচু হইয়া (লব) গিয়া পড়িবে। হাত-বোমা ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ঝুকিতে শুইয়া পড়িতে হইবে অথবা সম্মুখে ভালো আড়াল থাকিলে তাহার পশ্চাতে নীচু হইতে হইবে। ইহা আত্মরক্ষার জন্য। হাত-বোমা (বা ইট) যেখানে উঁচু হইয়া প্রথমে পড়িল তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়। পড়িয়া একটু বেশি বা কম গড়াইলে কিছু আসে যাইবে না। এইভাবে ক্রমশ ২৪ হাত হইতে ৫০।৬০ হাত দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তিনবারের চেষ্টায় দুইবার লক্ষ্যবস্তুর এক-আধ হাতের মধ্যে ইটগুলি পড়িলে কৃতকার্য হওয়া গেল বলিয়া ধরা যায়। ইহার পরে চলন্ত বস্তুকে লক্ষ্য করা শিখিতে হইবে। একজন সাহসী বন্ধু ভাল একখানি তক্তা হাতে লইয়া সাইকেল চালাইয়া যাইবে এবং সেই সময় দূর হইতে শিক্ষার্থী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইট বা নরম মাটির ঢিল ছুঁড়িয়া চলন্ত গাড়ীকে জখম করা শিখিবে। সাইকেল আরোহী ঐ কাঠের সাহায্যে ইটগুলি ঠেকাইবে।

আড়াল লইবার ও হাত-বোমা ছুঁড়িবার কায়দা

একজন ভারতীয় সৈন্য হাত-বোমা ছুঁড়িতেছে।

ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার সময় তাহার নীচে হাত-বোমা গড়াইয়া দিতে হয়। তখন হাত নীচে ঝুলাইয়াই বোমা ফেলিতে হয়। ইহা সহজেই অভ্যাস করা যাইতে পারে।

এই হাত-বোমা চালনা শিক্ষার প্রসঙ্গে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য বার্টলেটের বেতার বক্তৃতা মনে পড়িতেছে :—

"I still remember dining one evening in Hankow and being told by my almost incredibly beautiful and graceful Chinese neighbour that her arm was very stiff, because she had spent all the morning learning to throw hand-grenades. That was four years ago and we are still

arguing here in England whether women should be taught how to use a rifle."

আজ ভারতবাসীর মতো মরা জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে, নাৎসী আক্রমণের হাত হইতে তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, সব কিছু—তাহার জাতির সম্মানকে বাঁচাইতে হইলে চীনাবাসীদের মতো স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শত্রুকে ঠেকাইবার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেই হইবে। অন্য কোনো পথ বা উপায় নাই।

(৪)

রাইফেল-বাহিনীর গোড়ার কথা

"Riflemen, form riflemen"

—Statesman.

জাপানী বা জার্মাণীর সহিত লড়িয়া জিতিবার বাসনা থাকিলে ইহা ছাড়া গতি নাই। মিত্রপক্ষের বার-বার পরাজয় হইতে যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে, তবে ইহাই। অবশেষে ষ্টেটস্‌ম্যানেরও চোখ খুলিল এবং তাঁহারা ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি টেনিসনের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রাইফেল ধরিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, কাহারও সাহায্য চাহি না, আমাদের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে রাইফেল ও রসদ প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা, যাহারা জাপানী সাম্রাজ্য-লিপ্সুদের খতম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাদের হাতে সেই রাইফেল দাও; আমাদের পরখ করিতে দাও, জাপানীর 'স্খলিত তপ্ত লৌহের বন্যাকে' রুখিতে পারি কিনা! সিঙ্গাপুর পতনের দিনে অতি দুঃখে এই কথা তাঁহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যভোগের নেশা যাইবে কোথায়! পাঁচদিন পরেই তাঁহারা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উক্ত স্বীকৃতিকে একটু খাটো করিয়া বলিলেন,—তাই

বলিয়া জনসাধারণ-যে নিজ নিজ দলের অনুগত থাকিয়া ভলান্টিয়ারবাহিনী গড়িবে, তাহা কোনোমতেই সমর্থনীয় নহে ; তাহাদের দেশের স্থায়ী-সৈন্যদলের অধীনে কাজ করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহারা নাকি ভবিষ্যতে অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে।

ষ্টেটস্‌ম্যানের এই অভিব্যক্তির পশ্চাতে জনগণের প্রতি যে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা মারাত্মক। জাপানীর উদ্যত করাল গ্রাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও আজ শাসকগণ এই অবিশ্বাসকে ভাঙিয়া সৈন্য ও সাধারণের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা বোধ জাগাইয়া তুলিবার মতো যদি কিছু করিবার থাকে, তাহা না করিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে সর্বগ্রাসী যুদ্ধের মূল কথাটি তাঁহারা এখনও বুঝেন নাই অথবা বুঝিয়াও ভাবিতেছেন, হয়ত-বা জাপানী দয়া করিয়া ভারতে নাও আসিতে পারে। হয়ত মনের গোপন কোণে আশা রহিয়াছে—এপর্যন্ত অনেক যাত্রায় তো রেহাই পাইয়াছি ; এবারও পাইলে পাইতে পারি। সর্বগ্রাসী যুদ্ধ লোভীর এ লোভকে সহ্য করিবে না। আজ স্রধু গোলাগুলীর বড়াই করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া যাইবে না ; সৈন্যকে আজ দেশের মাটি ও মনের সহিত গাছের শিকড়ের মতো জড়িত হইয়া নাৎসী আক্রমণের ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে সহিতে হইবে। দেশের এই মাটির গাঁথুনি ও রস-সিঞ্চনের ক্ষমতাকে অবহেলা করিয়া পরগাছা সৈন্য ও সেনানীর ভরসায়

রাইফেল-বাহিনীর গোড়ার কথা

কাল-বৈশাখী সামলাইবার আশা রাখিলে, বন্দরের পর বন্দর, দুর্গের পর দুর্গের দুর্গতিই সুধু আমরা দেখিব। অপেক্ষার ইহা সময় নহে। জীবন-মৃত্যুর সমস্যা সম্মুখে। জাপানের অগ্রগতি আমরা রুখিব; দাও আমাদের হাতে রাইফেল দাও— ইহাই আমাদের কথা:

—Riflemen, form riflemen.

* * *

এই রাইফেলধারী যোদ্ধার শিক্ষার পদ্ধতিই এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। রাইফেল বা হাত-বোমা চালনা শিক্ষার পূর্বে দুই-একদিন স্থানীয় দলের সকলকে কোনো একস্থানে দ্রুত সমবেত হইতে এবং পুনরায় মুহূর্ত মাঝে বিক্ষিপ্ত হইতে অভ্যস্ত হওয়া চাই। ইহার জন্য আমাদের সামরিক বাঁধাধরা নিয়ম মানিয়া চলিবার বা বিজ্ঞানসম্মত ভাষা ব্যবহার করিবার কোনো আবশ্যক নাই। নিখুঁত যোদ্ধা হইবার সময় আমাদের হাতে নাই; কাজ চালাইবার মতো হইলেই হইবে। সৈন্যদের প্যারেডের সময় আদেশ দিবার কসরতি ভাষা শুনিয়া আমরা ভাবি, ইহা আয়ত্ত করিতে বছর কাটিয়া যাইবে। এই কসরতির কোনো আবশ্যকতা নাই। স্থানীয় ভাষা অনুযায়ী অল্প কথায় উদ্দেশ্য জানাইতে পারিলেই হইবে। যেমন, শুইয়া মাটির আশ্রয় লইতে বলিবার সময় "মাটি কামড়াও" বলিলেই চলিতে পারে।

ধরুন, আপনাদের দলে ৩০ জন লোক আছে। পাঁচ-পাঁচজন করিয়া ভাগ হইয়া প্রত্যেকটি দলে একজন নেতা ঠিক করিয়া নিন। প্রত্যেক দলের পাঁচ জনকে এক, দুই, তিন করিয়া স্থায়ী নম্বর জানাইয়া দিতে হইবে, আবার পাঁচটি দলকে ক, খ, গ করিয়া ভিন্ন নাম দিতে হইবে। জড়ো হইবার আদেশ দিলে প্রথম 'ক' দল, তাহার কিছু পশ্চাতে 'খ' দল, এইভাবে পর পর পাঁচটি দল দাঁড়াইয়া যাইবে; প্রত্যেক দলের পাঁচজন সভ্য ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পাশাপাশি দাঁড়াইবে। ইহার পর একসাথে ঘুরিতে, চলিতে ও দৌড়াইতে শিখিতে হইবে। ইহা করিবার সময় সমান তালে কদম মিলাইতে বা গোড়ালির উপর নিয়ম মাফিক ঘুরিতে অযথা সময় নষ্ট করিবার কোনোই আবশ্যক নাই। কাজ হাসিল হইলেই হইল। রাইফেল চালনা জানিবার পূর্বে বিক্ষিপ্ত হইতে জানা চাই। কারণ শত্রুর সম্মুখে কখনও জড়ো হইয়া গুলী করিতে নাই। জড়ো হইয়া থাকিলে যেমন আমাদের গুলীর জালকে বিস্তৃত করা সম্ভব নয়, তেমনি শত্রুও আমাদের জড়ো ঝাঁকে গুলী করিয়া অধিক ক্ষতি করিতে সমর্থ হইবে। বিক্ষিপ্ত হইবার সময় দলগুলি ছুটিয়া নির্দিষ্ট এলাকায় ২৫ হইতে ৫০ কদম অন্তর অন্তর স্থানে হাজির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি যোদ্ধা ছুটিয়া গিয়া ৫ হইতে ১০ হাত অন্তর শুইয়া পড়িবে। ইংরাজী সামরিক ভাষায় ইহাকে extension করা বলে।

রাইফেল-বাহিনীর গোড়ার কথা

রাইফেল বা বন্দুক চালনার দূরত্ব অনুমান করিতে শেখাই প্রথম কর্তব্য। হাত-বোমার পাল্লা ৫০।৬০ হাত, কিন্তু রাইফেল এক বা দেড় মাইল পর্যন্ত তাক্ করা যাইতে পারে। অবশ্য ৬০০ গজের অধিক দূরে লক্ষ্য ভেদ করা কঠিন। ইহার পাল্লা বিস্তৃত হওয়াতে দূরত্বের হিসাবও বেশি রাখিতে হয়। হাত-বোমার মতো এখানেও দূরত্বকে অভ্যাসের দ্বারা সঠিক অনুমান করিতে হইবে। তবে দুইটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা যাইতে পারে। হাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠি মাটির সমান্তরালে রাখিয়া দূরের কোনো ঘর অথবা দালানের দিকে ধরিতে হইবে। এখন এক চক্ষু বুজিয়া লক্ষণীয় হইতেছে, আঙ্গুলের এবং ঘরখানির পারস্পরিক প্রস্থ।

হাতের দৈর্ঘ্য এবং আঙ্গুলের প্রস্থ প্রতি লোকের ভিন্ন ভিন্ন থাকাতে প্রত্যেককে নিজ নিজ অনুযায়ী অনুমান করিতে শিখিতে হইবে। ধরুন, আমার আঙ্গুল যখন ঘরখানিকে ঠিক পূরাপূরি ঢাকিয়া ফেলে তখন ধরিয়া লইব ২৫০ গজ। দ্বিতীয় পন্থা

হইতেছে, একইভাবে হাত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলিকে ঊর্ধ্বমুখী করিতে হইবে। প্রথমে ডান বা বাম চোখ বুঁজিয়া ঘরের লাইনে আঙ্গুলকে রাখিব এবং সেই অবস্থায় হাত স্থির রাখিয়া আর এক চোখ বুঁজিয়া দেখিব আমার আঙ্গুলটি এবার ঐ ঘর হইতে কতদূরে সরিয়া গেল। দেখা যাইবে ঘরখানি যতদূরে থাকিবে ততই সেই অনুযায়ী আমার আঙ্গুলটি কম-বেশি সরিয়া যাইবে। লক্ষ্য যত নিকটে, আঙ্গুল তত কম সরিবে এবং লক্ষ্য যতদূরে থাকিবে ততই আঙ্গুল বেশি সরিয়া যাইবে। আঙ্গুল ও ঘরের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ দিয়া দূরত্ব অনুমান করা সম্ভব।

ইহার পর বন্দুক বা রাইফেলের তাক্ করিতে জানা চাই। আমাদের লক্ষ্য ঠিক করিবার জন্য পর্যাপ্ত গুলী না মিলিবার সম্ভাবনাই বেশি। গুলি না ছুঁড়িয়াও অন্য উপায়ে আমরা খানিকটা এই দিকে অগ্রসর হইয়া থাকিতে পারি এবং এই অভ্যাস করিয়া রাখিলে পরে সামান্য গুলীর খরচে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সাহস করা যায়।

"In Spain few of our men had more than five rounds to practice with before they went into action."—Wintringham

একখানি কাঠির মাথায় পিসবোর্ড বাঁধিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ছোট ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে। আমাদের একটি লোক দূরে ঐখানি পুঁতিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে ঐ ছিদ্র

দিয়া দেখিবে এবং সেই সময় শিক্ষার্থী শুইয়া দূর হইতে সেই ছিদ্রের দিকে বন্দুক সাহায্যে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু খবরদার, বন্দুকে-যে গুলী ভরা নাই, তাহা যেন পূর্বেই সুনিশ্চিতভাবে দেখিয়া লওয়া হয়। পিসবোর্ডের পশ্চাতের লোক গুলী করিতে আদেশ দিলে শিক্ষার্থী তখনই বন্দুকের তাক্ করিয়া ঘোড়া টিপিবে। ছিদ্র দিয়া দেখিতে হইবে যে,

বন্দুকের মাছি ও পশ্চাতের বিন্দু অথবা রাইফেলের fore-sight এবং back sight ছিদ্রের সহিত এক লাইন হইয়াছে কি না। তাহা যদি হয়, বুঝিলাম লক্ষ্য ঠিক হইতেছে। মুহূর্ত মাঝে বন্দুক এইভাবে ধরিতে শিখিতে হইবে। অধিকাংশের তাক্ নষ্ট হয় ঘোড়া টিপিবার সময়। ঘোড়া টিপিবার নিয়ম হইতেছে, কখনই ঝট করিয়া চাপ দিতে নাই; ধীরে ধীরে এবং সর্বক্ষণ সমান জোরে ঘোড়াকে টানিয়া আনিতে হইবে। টিপিবার সময় যেন খেয়াল থাকে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ও স্বাভাবিকভাবে পড়িতে থাকিবে; কখনই বন্ধ অথবা দ্রুত যেন না হয়। বন্দুকের অভাবে সরু বাঁশ ৪৪ ইঞ্চি মাপে (রাইফেলের দৈর্ঘ্য) খণ্ড করিয়া

তাহার মাথায় একটি এবং মধ্যস্থলে একটি পেরেক নীচু করিয়া পুঁতিয়া তাক্ করা শেখা যাইতে পারে। অনেকে ইহা শুনিয়া হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে, আমরা জীবন-মৃত্যু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাইফেল আমাদের এখন নাই সত্য; কিন্তু রাইফেল শত্রুর হোক আর মিত্রের হোক, হাতে পাইবামাত্রই যেন শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারি—এই শিক্ষাটুকু যে-কোনো উপায়ে এখনই গ্রহণ করিতে আমাদের লজ্জার কী আছে?

গুলী চালনার পদ্ধতি

ইহার পর শত্রুকে গুলী করিবার যে কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ যেমন হিংস্র হইয়া উঠে তেমনি তাহার প্রাণের মায়াও বড় হইয়া উঠে। সে মারিতে চায় কিন্তু বাঁচিতেও চায়। এই বাঁচার তাগিদে কারণে-অকারণে সামান্য সন্দেহে সে চারিদিকে অন্ধকারে ঢিল মারিবার মতো অজস্র গুলী চালাইতে থাকে। সময় সময় ইহা এত বেশি হয় যে, সেনাপতির পক্ষে এত গুলী জোগাড় করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু গণ-সেনার রসদ অতি কম। প্রাণের মায়ায় অযথা গুলী চালাইবার আদেশ তাহার নাই। প্রত্যেকটি গুলীর হিসাব

করিয়া তাহার রসদ খরচ করিতে হইবে। এইজন্য তাহার গুলীর লক্ষ্য কোন্‌দিকে করিবে তাহা ভালো করিয়া জানা দরকার।

ব্যাঘ্র শিকারে তাহার মাথায় গুলী করিতে হয়। কারণ তাহার অন্যত্র গুলী বিদ্ধ হইলে সে পলাইবে। শিকার পলাইলে শিকারীর পরিশ্রম বার্থ। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পলাইলে যোদ্ধার কার্যসিদ্ধি হইয়া আসে। তাই শত্রু যখন খোলা মাঠে সম্মুখে আড়াল দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার দেহকে কোণাকুণি ভাবে তাক্ করা উচিত। ইহাতে তাহার সম্মুখের আড়ালকে যেমন ব্যর্থ করা যায় তেমনি গুলীর পরিসরে লক্ষ্যবস্তুও পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হইতে পারে বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধে এইভাবে দেখিয়া দেখিয়া গুলী করিয়া মারিবার জন্য সঙ্গীনধারী সৈন্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না; ট্যাঙ্ক ও আর্মার্ড-কারের যুদ্ধে রাইফেল-ধারী যোদ্ধার স্থান নাই। কিন্তু সেলাইয়ের কাজে যেমন দৃঢ় ও অনমনীয় সূচের সাহায্যে দীর্ঘ ও অসংখ্য সূতার জালে বুনানি সৃষ্টি করিতে হয়, বর্তমান যুদ্ধেও তেমনি মাত্র দৃঢ় ও অপ্রতিহত ট্যাঙ্কের সাহায্যে অগণিত ও অসংখ্য সৈন্যের জাল বুনিয়া চলিতে হয়। সূতা বাদ দিয়া যেমন সুধুমাত্র সূচের সাহায্যে বুনানি সৃষ্টি হয় না, তেমনি অগণিত সৈন্য বাদ দিয়া সুধু ট্যাঙ্কের সাহায্যে যুদ্ধের জাল বুনা চলে না। ট্যাঙ্ক দিয়া

সূচের মতো বিদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু দেশ দখল করা যায় না। নগ্ন সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

এক-এক জনের পক্ষে যেমন কোণাকুণি গুলী করিবার কথা বলিলাম, তেমনি যখন সৈন্যের ছোট ছোট ইউনিটগুলি পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে তাহাদের পক্ষেও ইহা অধিকতর প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও বড় ছবিটি দেখিলে ইহা বুঝা যাইবে। পাশাপাশি দলগুলির পরপর আনুপ্রস্থিক বা কোণাকুনিভাবে ((Cross fire) গুলী করিতে হইবে। সকলেই যদি সোজাসুজি সম্মুখে গুলী চালনা করিতে থাকে, দেখা যাইবে পরস্পরের গুলীর গতিপথের মধ্যে বেশ খানিকটা প্রশস্ত নিরাপদ স্থান থাকিয়া যায় (২নং ছবি) এবং শত্রুদল নির্বিবাদে এই পথগুলি বাছিয়া আগাইয়া আসিতে পারে। অনেক সময় একমাইল বা দেড়মাইল দূর হইতেই শত্রুর অগ্রগতি অলক্ষ্যে থাকিলেও সে গতিকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে গুলী চালনা করিতে হয়। এই অবস্থায় শত্রুকে দেখিয়া দেখিয়া গুলী করা সম্ভব নয়। এই সময় আনুপ্রস্থিক বা কোণাকুণি গুলী না করিলে দ্বিতীয় ছবির পন্থায় শত্রুদল অগোচরে ও নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে ; কিন্তু কোণাকুণি গুলী চলিলে সম্মুখভাগে শত্রু আসিবার যে-কোনও লাইনের ভিতর—এক স্থানে না হয় আরেক স্থানে—গুলীর আঘাতে আহত হইতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি ইউনিটগুলি যদি

২
৩
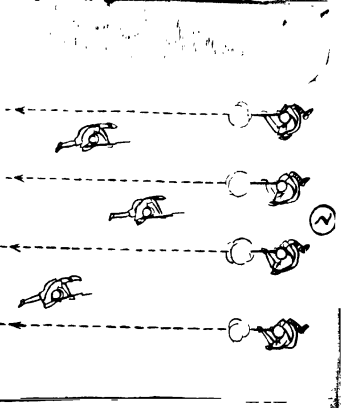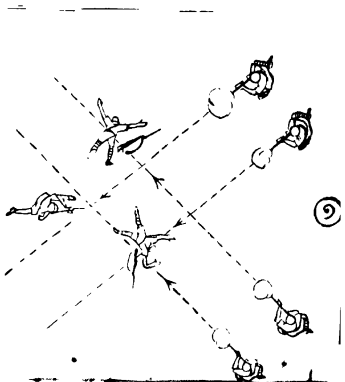
১নং দক্ষিণ দিকে, ২নং বামদিকে আবার ৩নং দক্ষিণ দিকে, ৪নং বামদিকে এইভাবে বরাবর গুলী করিয়া যায়, দেখা যাইবে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বস্থানে গুলীর জাল বুনিয়া গিয়াছে। এই জালকে ভেদ করিতে যাইয়া শত্রুর পক্ষে গুলীর ঝাঁক এড়ানো সম্ভব নয়।

এই কোণাকুণি গুলী চালনায় আরেকটি বিশেষ সুবিধা আছে। বড় ছবিটিতে দেখা যাইবে, যখন দুইপার্শ্বে সৈন্যদল-গুলি কোণাকুণি গুলী চালাইতেছে তখন মধ্যস্থলে কয়েকটি সৈন্য ট্রেঞ্চ হইতে উঠিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। দুইদিক হইতে গুলী চালাইলে মধ্যস্থলে খানিকটা নিরাপদ স্থানের সৃষ্টি হয় (৩নং ছবি)। এই স্থানের সুবিধা গ্রহণ করিয়া সকল মহড়া ব্যাপিয়া ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সৈন্যদল অগ্রসর হয় এবং পরে ইহারাই আবার কিছু দূর অগ্রসর হইলে থামিয়া পর পর অবস্থিত হইয়া কোণাকুণি গুলী করিতে থাকে। তখন এই অগ্রবর্তী দলগুলির দ্বারা কোণাকুণি গুলী চালনার ফলে পিছনের দলগুলি আবার নূতন নিরাপদ স্থানের সুবিধা পাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাকে বলে একে অপরের সাহায্যে (supportএ) অগ্রসর হওয়া। বর্তমান যুদ্ধে রাইফেল-বাহিনী বা ব্রেণগান-বাহিনী বা মেসিনগান-বাহিনীর পক্ষে গুলী করিতে করিতে অগ্রসর হইবার এই একটি মাত্র পন্থাই আছে। নান্য পন্থা।

(৫)

টহলদারী গরিলা

যে-কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দুই পক্ষ অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের খবর সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কারণ এই খবরের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আবশ্যকমতো সৈন্য সমাবেশ করে এবং সৈন্য চালনা করে। শত্রু-সৈন্যদল কোন্ পথে আসিতেছে, কোথায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, কোথায় আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, পথের মাঝে কোথায় বিল-বাওর আছে, কোথায় নদী আছে, কোথায় গিরিপথ আছে—এই সংবাদগুলি না পাইলে রণ-পরিকল্পনায় বিপর্যয় ঘটিতে পারে। ইহার জন্য যখন কোনো সৈন্যদল অগ্রসর হইতে বা পশ্চাতে হটিতে থাকে, তখন তাহার সম্মুখে অনেক দূরে পূর্ব হইতেই টহলদারী সৈন্যকে এক-একজন করিয়া বা দুই-দুইজন করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাদের কাজ হইল পথে বিপথে, গ্রামে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অগ্রসর হওয়া এবং সংবাদ সংগ্রহ করা। কোনো সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা পশ্চাতে সেনাপতির নিকট তারযোগে বা লিখিয়া বা নিজে ছুটিয়া গিয়া তাহা পৌঁছাইয়া দেয়। এই এক-একটি খবরের উপর সময় সময় গোটা যুদ্ধের হার-জিত নির্ভর করে।

টহলদারী গরিলা

কোনো টহলদারী সৈন্য যদি হঠাৎ বিহ্বল হইয়া সামান্য শত্রু সংখ্যা দেখিয়াই পশ্চাতে ফলাও করিয়া খবরটি পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সেনাপতি বিশাল সৈন্যদল সেই দিকে পাঠাইয়া দিয়া সমূহ বিপদে পড়িতে পারেন। কাজেই টহলদারী সৈন্যের কার্য অতি গুরু দায়িত্বসম্পন্ন। ইহাদের বিপদের ঝুঁকিও অত্যন্ত বেশি। অধিকাংশ সময় ইহাদের প্রাণ হাতে করিয়া শত্রুর ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়।

গরিলা যুদ্ধে এই টহলদারী সৈন্যের দায়িত্ব আরও অধিক। কারণ আমাদের হাতে অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা কম থাকায় সঠিক ও খুঁটিনাটি সংবাদ না মিলিলে শক্তিমান শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণে বিহ্বল করা সম্ভব নয়। আমাদের জানা চাই—শত্রুসৈন্যরা কত সংখ্যায় দলে দলে ভাগ হইয়াছে; একদল অন্যদল হইতে কত দূরে অবস্থিত; দলটি যখন বিশ্রাম গ্রহণ করে তখন তাহাদের রক্ষীদল কীভাবে পাহারা দেয়; দলের অধীন কী অস্ত্র ও কত অস্ত্র আছে; পথে চলিবার সময় ইহারা কীভাবে চলে: ইহাদের রসদ ও গোলাগুলী কীভাবে পশ্চাৎ হইতে আনা হয়—ইত্যাদি। গরিলা-যোদ্ধারা যেমন রাত্রের অন্ধকারে অতর্কিতে বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে বা বিচ্ছিন্ন সৈন্য ও রসদবাহী যান-বাহনাদি ধ্বংস করিতে থাকে, তেমনি সংবাদ সংগ্রহের কার্যও সাধারণত রাত্রের অন্ধকারে বন ও জঙ্গলের

আড়ালে অগ্রসর হইয়া শত্রু-ঘাঁটির বা শত্রুর চলাচল-পথের অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া করিতে হয়। এই কার্য করিবার সময় কতকগুলি সাধারণ কথা মনে রাখা আবশ্যক। তাহাই একে একে বলিব।

(১) সংবাদ-সংগ্রহকারী গরিলা টহলদারী সৈন্যরা (Patrols) কখনও একজন অথবা দুইজনের বেশি একত্রে থাকিবে না। পোষাক অত্যন্ত হাল্কা হইবে এবং চলিবার সময় শব্দ হইবার মতো কোনো কিছু সঙ্গে থাকিবে না, অথবা আলোয় চিক্‌চিক্‌ করিবার মতো বোতাম বা অন্য কিছু থাকিবে না।

(২) ইহাদের তীক্ষ্ণ কাণ চাই; গাড়ী ট্রলি, মোটর-কার, মোটর সাইকেল, লঞ্চ প্রভৃতি চলিবার সময়, পরিখা কাটিবার সময়, পায়ে চলিবার ও দৌড়াইবার অথবা হামাগুড়ি দিয়া চলিবার যে বিভিন্ন প্রকার শব্দ হয় তাহা ধরিতে অভ্যস্ত থাকা চাই। গরিলা-যোদ্ধারা যেন জানিয়া রাখে যে, প্রত্যেক মানুষ এক কাণ অপেক্ষা অন্য কাণে অধিক শুনিতে পায়, সেই কাণ মাটির সহিত লাগাইয়া রাত্রের নির্জনতায় বহুদূর হইতে উপরোক্ত শব্দগুলি সহজে ধরা সম্ভব।

(৩) শিক্ষিত পায়রা-যে সংবাদ-সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করে তাহা সকলের জানা আছে; কিন্তু বনের পাখীও টহলদারীদের যথেষ্ট সাহায্য করে। পাখীরা আতঙ্কে কীভাবে

চীৎকার করে তাহা জানিয়া রাখিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যখনই রাত্রের অন্ধকারে বড় সৈন্যদল কোনো বনে বা গ্রামে প্রবেশ করে তখন পাখীর দল আতঙ্কে চীৎকার করিয়া সৈন্যরা যেদিক হইতে আসে তাহার বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করে ; অথবা কোনো কোনো পাখী স্বস্থানে বসিয়া আতঙ্ক-চীৎকারে দূরের পাখীকে বিপদের সঙ্কেত জানায়। পাখীর বিপদের সঙ্কেত এবং আনন্দ-আহ্বানের সঙ্কেতকে তফাৎ করিতে জানা চাই।

(৪) রাত্রের অন্ধকারে পেট্রোল-সৈন্যদের অধিকাংশ সময় দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। অন্ধকার আকাশের বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রকে চিনিতে শেখা চাই, তাহা হইলে এই নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া পেট্রোল-সৈন্য নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হইতে পারে। দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলে বাতাসের গতি অনেক সময় সাহায্য করিতে পারে। এক-একটা দেশে এক-এক সময় বিশেষ দিকে বাতাসের গতি প্রবাহিত হয়।

(৫) পেট্রোল-সৈন্যরা সাধারণত নরম মাটি, নীচুস্থান, ঝোপের ভিতর, গাছের আড়াল ও ছায়া দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে। অল্প আলোছায়া থাকিলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; অর্থাৎ একটি আড়াল হইতে অন্য আড়াল পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পর কিছু সময় দেখিয়া শুনিয়া আবার অগ্রসর হওয়া ভালো। তবে অন্ধকারে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর

হইয়া মাঝে মাঝে থামিয়া নিকটে কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা তাহা দেখিবে। একটি আড়াল হইতে বাহির হইবার সময় কখনও সে হঠাৎ দেখা দিবে না। ধীরে ধীরে এবং অতি অল্পে অল্পে আড়াল হইতে বাহির হইবে। ইহাতে নিকটস্থ শক্রর দৃষ্টিকে এড়ানো সম্ভব। এই সকল চলাফেরার সময় তাহাকে সাধারণত হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হইবে। যখন শক্রর লক্ষ্যে আসিয়া পড়িবার ভয় অপেক্ষা দ্রুত চলিবার আবশ্যক, তখন এই হামাগুড়ি দিয়া চলিবার সময় হাত ও হাঁটুর সাহায্যে চলিতে হইবে। হাত দু-খানি ঠিক যে যে-স্থানে পড়িবে, হাঁটু দু-খানি ঠিক সেই-সেই স্থানে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইবে—ইহাতে অযথা শব্দ হইবার আশঙ্কা কম। শক্র নিকটে থাকিলে কনুই ও হাঁটুর সাহায্যে চলিতে হইবে। শক্র যদি অতি নিকটে থাকে তবে হাত পায়ের পাতার সাহায্যে হামাগুড়ি দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই অবস্থায় হাতগুলি মাথার বেশ খানিকটা আগে রাখিতে হইবে এবং হাঁটুকে মাটির সহিত লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। হামাগুড়ি দিবার সময় ডান বা বাম পার্শ্বে সরিতে হইলে দেহকে ঘুরাইয়া না-চলিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখে মুখ করিয়া পার্শ্বে সরিয়া বা গড়াইয়া যাওয়াই শক্রর দৃষ্টিকে এড়াইবার কৌশল। বন বা ঝোপের ভিতর দিয়া চলিবার বা হামাগুড়ি দিবার সময় বিনাশব্দে অগ্রসর হওয়া এক দুরূহ সমস্যা। সমস্যা হইলেও পেট্রোল সৈন্যদের

অভ্যাসে ইহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। বাঙলা দেশের গরিলাদের এই কৌশলে অভ্যস্ত হওয়া সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমাদের দেশে ব্যাঘ্র ও হরিণ শিকারীর অভাব নাই, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের ইহা শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শত্রুরা সাধারণত যে-পথে আমাকে আশা করিতে পারে সে পথে অগ্রসর না হইয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সোজাসুজি না গিয়া পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইতে হইবে।

(৬) খবর সংগ্রহের জন্য ঘোরাঘুরি বা ছুটাছুটি করা অপেক্ষা কোনো একটি সুবিধামতো স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া চোখ ও কাণ সজাগ রাখিলে অধিক খবর সংগ্রহ করা যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে কোনো কোনো পেট্রোল সৈন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া শত্রু আসিবার পথের পার্শ্বে গাছের উপরে পাতার আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া বহু মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে।

(৭) পেট্রোল-সৈন্য গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া কাজ হাঁসিল্ করিবার পর যখন ফিরিবে, তখন কখনই একই পথে আসিবে না। কারণ, ইহা খুবই সম্ভব, শত্রুরা নানা উপায়ে সন্ধান পাইতে পারে যে, এই পথে বিপক্ষের পেট্রোল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে ; এবং সে ক্ষেত্রে তাহারা বিপক্ষের পেট্রোল-সৈন্যকে

মারিবার জন্য ঐ নির্দিষ্ট পথের মাঝে অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

(৮) গরিলা-সৈন্যদলকে এইভাবে পেট্রোল-সৈন্যের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করা ছাড়াও নানা অভিনব পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে! আমরা গত কয়েক প্রবন্ধান্তরে বিশদ বর্ণনা করিয়াছি, কীভাবে জাপানী সৈন্যরা ধীরে ধীরে সহর ও সড়ক ছাড়িয়া গ্রামের অধিবাসীর সংস্পর্শে আসিবে। ইহাই গরিলা বাহিনীর সুবর্ণ সুযোগ। এই সংস্পর্শ বা সংযোগের সুযোগে শত্রুর মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে। কখনও খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার অছিলায়, কখনও শত্রুর রাস্তাঘাট তৈরী করিবার কাজে যোগ দিয়া, কখনও গো-বেচারা সাজিয়া পথে-ঘাটে চলাফেরা করিয়া শত্রুর ঘাঁটির বা সৈন্য ও রসদ চলাচলের বিশদ খবর লইতে চেষ্টা করিতে হইবে! দেশে দেশে দেখা গিয়াছে, এই কার্যে গরিলা যুদ্ধের সৈনিকদের প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি ও তৎপরতা আক্রমণকারী শত্রুকে বিমূঢ় করিয়াছে।

(৬)

শত্রু-বিমানের আক্রমণমুখে গরিলাদল

বঙ্গ ও আসামের প্রথম আক্রমণ বোমা বর্ষণের দ্বারা শুরু হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বোমার আঘাতে একদিকে মিত্র-শক্তির সমরায়োজনে বিচ্ছিন্নতা আনা এবং অন্যদিকে জন-সাধারণের মনে আতঙ্ক আনিয়া তাহারা যে যুদ্ধে সহযোগিতা করিতেছে তাহাতে বিঘ্ন ব্যাঘাত ও বিশৃঙ্খলা ঘটানো। এই আঘাতের সম্মুখে জনসাধারণ কীভাবে আত্মরক্ষা করিবে তাহা লইয়া বহু সরকারী ও বেসরকারী সঙ্ঘ হইতে দীর্ঘ ফিরিস্তি বাহির হইয়াছে। বাঙলা ও আসামের গরিলা-যোদ্ধারা ইহা হইতে অনেক ছোট-খাট শিক্ষার বিষয় খুঁজিয়া পাইবেন। কিন্তু গরিলা-যোদ্ধার দায়িত্ব এখানেই শেষ নয়। বর্ত্তমান যুগের এই নূতন মারণ-অস্ত্র এক সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধেই বিশেষ-ভাবে নিয়োজিত হইবে। আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় যেমন গরিলাদের কর্মতৎপরতা বিশেষ দেখানো সম্ভব নয়, তেমনি জাপানীরাও ইহাদের বিরুদ্ধে লড়িবার মতো কোনো উৎসাহ দেখাইবে না! কিন্তু যুদ্ধ যতই অগ্রসর হইবে, ততই সম্মুখের জাপানী সৈন্যরা পশ্চাৎ হইতে দীর্ঘপথে রসদ সরবরাহের উপর

নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে ; এবং ততোধিক গরিলাদের দুঃসাহসিক কার্যাবলী দেখা দিবে ! এমনি সময়ে জাপানীরা পশ্চাতের অধিকৃত অঞ্চলকে গরিলাদের হাত হইতে নিরাপদ করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিবে। কিন্তু গরিলাদের খুঁজিয়া পাওয়া দায়। হয়ত জাপানী সেনাপতি শুনিল, কোনো পথের মোড়ে এক লরী-বোঝাই রসদ গরিলারা তীব্র ও অতর্কিত আক্রমণে লুটপাট করিয়া লইয়া উধাও হইয়াছে। বড় বড় রাস্তা জানা আছে, কিন্তু জাপানীরা বাঙলার গ্রামের আনাচ-কানাচ পথের সন্ধান কোথায় পাইবে। কোন গ্রাম কোন মাঠ কোন বিল ডিঙাইয়া গরিলার দল উধাও হইয়াছে, তাহার নজির পাওয়া অসম্ভব। এমনি অবস্থায় জাপানীরা গরিলার বিরুদ্ধে বোমারু বা মেসিনগানবাহী হাওয়াই জাহাজ লেলাইয়া দিবে। এই নূতনতম অস্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙলার গরিলা-যোদ্ধার কী করিবার আছে তাহাই আলোচনা করিব।

আত্মরক্ষার প্রশ্ন

গরিলাদের সাধারণ নীতি হইবে অবসর সময়ে ছড়াইয়া থাকা এবং আক্রমণ করিবার পূর্ব মুহূর্তে গোট হইয়া আবার পর মুহূর্তে ছড়াইয়া পড়া। জনগণই আমাদের আশ্রয়স্থল। তাহাদের আশ্রয় হইতে সাপের ছোবলের মতো তীব্র বেগে শত্রুকে আহত করিয়া আবার তাহাদের আশ্রয়ে দেশব্যাপী

কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতে হইবে। ইহাই গরিলা যুদ্ধের মূল কৌশল। তবুও সময় সময় এমন অঘটন ঘটিবে যে, আমাদের আশ্রয় ও ঘাঁটি হইতে শত্রুর অধিকৃত বা তাহার আওতায় অবস্থিত অনেকগুলি গ্রাম ডিঙাইয়া তবে শত্রুর রসদ-পথে আঘাত হানিতে পারিব। গরিলারা যখন শত্রুর আওতায় অবস্থিত ঐ গ্রামের ভিতর দিয়া আনাগোনা করিবে, তখন তাহারা অধিকাংশ সময়ই একত্রিত বা গোট হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। শত্রুরা এই গোট দলকেই হাওয়াই জাহাজের আক্রমণে নিঃশেষ করিতে চাহিবে। এই অবস্থায় আমাদের কী করিবার আছে তাহাই ভাবিবার বিষয়।

(১) হাওয়াই জাহাজের সম্মুখে আত্মরক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইল আত্মগোপন করা। বিজ্ঞানের অবদানে মানুষ পাখা জুটাইয়াছে ; কিন্তু সে আজ পাখা মেলিয়া হংসবলাকার রূপে কবির মনে আবেগ না আনিয়া গৃধিনী শকুনীর মতো মানুষের মৃত্যু কামনা করিতেছে। তবু সান্ত্বনা, শকুনী হইয়াও সে আজ শকুনীর মতো চক্ষু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই। এই দুর্বলতারই সুযোগ আমাদের লইতে হইবে। অনেকের হয়ত জানা নাই যে মাটি ছাড়িয়া কিছু উপরে উঠিলেই সব আবছায়া হইয়া আসে। বোমারু চালক দুর্দান্ত বেগবতী জাহাজের উপর হইতে দূরবীণের কোনো সাহায্য লইতে পারে না। খোলা চোখেও দৃষ্টি বেশি দূর চলে না। এইজন্য কতক-

গুলি কথা জানা থাকিলে বোমারুর সম্মুখে আত্মগোপন করা খুবই সহজ—বিশেষ করিয়া গরিলাদলদের মতো ছোট দলের পক্ষে।

(ক) উড়োজাহাজ আসিতেছে জানিতে পারিলেই আত্মগোপনের প্রথম কথা হইল, নড়াচড়া বা চলাফেরা বন্ধ করিয়া স্থির হইতে হইবে। খোলা মাঠে যদি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায় তবে উপর হইতে লক্ষ্য করা দুরূহ।

(খ) দ্বিতীয় গোট হইয়া না থাকিয়া অবসর পাইলে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। অনেকগুলি অস্পষ্ট ছোট বিন্দু একত্রিত না থাকিয়া যদি ছড়াইয়া থাকে তবে তাহা সহজে নজরে আসে না। প্রতি ব্যক্তি অন্তত ৮।১০ হাত দূরে দূরে আঁকা-বাঁকা লাইন করিয়া থাকিবে।

(গ) কোনো গাছ, দেওয়াল বা বাড়ীর ছায়ায় থাকিলে উড়োজাহাজ চালক ১০০০ এক হাজার ফিট উপর হইতেও নজর করিতে পারে না।

(ঘ) বাংলা দেশের গ্রামে বন-ঝোপের অভাব নাই। বনের আড়ালে আশ্রয় লইলে উড়োজাহাজকে বোকা বানানো যায়। তবে বনের মধ্যে খোলা মাঠ বা পথকে উপর হইতে খুব স্পষ্ট লেখা যায়। সেজন্য বোমারু মাথার উপর থাকিতে কখনও গাছের আড়াল ছাড়িয়া পথে উঠিব না—এই প্রতিজ্ঞাই গরিলাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তবে রাস্তার পাশে গাছের

ভাল ছায়া থাকিলে তাহার আড়ালে সৈন্যদলকে বহু সময়ে নির্বিবাদে আত্মগোপন করিয়া চলাফেরা করিতে দেখা গিয়াছে।

(৬) এপর্যন্ত সমষ্টিগতভাবে আত্মগোপন করিবার কৌশলের কথা বলা হইল কিন্তু গরিলাদের ব্যক্তিগত আত্মগোপনের কথাও ভাবিতে হইবে। অনেকে ব্যক্তিগত আত্মগোপনের পন্থাগুলির কথা উপহাসের চক্ষে দেখিতে চাহিবে ; কিন্তু মৃত্যুর সম্মুখে এই উপহাস কাহাকেও রেহাই দিবে না। ইহাকেই ইঙ্গিত করিয়া বৃটেনের গৃহরক্ষীদলের উদ্দেশ্যে A. G. Elliot. লিখিতেছেন—

"The British have a tendency to laugh heartily at any ideas which they deem new fangled'. We laughed at tanks, at aeroplanes, at paratroops and although camouflage is by no means new many still regard it as a joke. This is regrettable for those who laugh at it to-day, may badly need it tomorrow and of all the services the Home Guard is the one in which personal concealment will be the most necessary"—Home Guard Encyclopedia.

ব্যক্তিগত আত্মগোপনের জন্য প্রথম (১) পোষাকের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। দূর হইতে লাল রঙকে সর্বাপেক্ষা ভাল দেখা যায়, তাহার পর নীল এবং তাহার পর হলুদ রঙ। ধূসর অথবা খাঁকি রঙই আমাদের পক্ষে শ্রেয় ; তবে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, আমরা যেখান হইতে চলাফেরা করিব সে স্থানের

ঘাস বা ক্ষেতের ফসল বা উন্মুক্ত মাটির রঙ অনুযায়ী পোষাকের রঙ করিতে পারিলে আত্মগোপন করা সহজ। উড়ো জাহাজ তো দূরের কথা, এমনও দেখা গিয়াছে গরিলারা গাছের গুঁড়ির মতো হাবি-জাবি রঙের পোষাক পরিয়া পথের পার্শ্বে গাছের গুঁড়ির নিকটে দাঁড়াইয়া সাইকেলবাহী শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়াছে। দ্বিতীয় (২) দূর বা উপর হইতে যোদ্ধার মুখমণ্ডলই সহজে লক্ষ্যে আসে। সেজন্য গরিলা যোদ্ধারা নাকের উপর দিয়া খাঁকি রঙের রুমাল বাঁধিয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিবে। আমাদের দেশে যেখানে সেখানে লতাগাছ পাওয়া যায়। এই লতা মুখে জড়াইয়া রাখিলে কাজ হাসিল্ হইতে পারে। আমাদের শিরস্ত্রাণ বা টুপী হয়ত জুটিবে না। কাজেই তাহার সমস্যা নাই। তবে মাথার কালো চুলকে ঢাকিবার জন্য লতার সাহায্য লইলেই চলিবে। খোলা হাত বা মুখমণ্ডলকে গোপন করিবার জন্য বিলাতে হোমগার্ড বাহিনীকে রঙের গুঁড়া ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। এই রঙ মাখিবার পন্থা হইল এক বা দুই ইঞ্চি চওড়া একটি বা দুইটি রেখা মুখের উপর দিয়া আঁকা বাঁকা বা কোণাকুণি করিয়া টানিয়া দিতে হইবে। সর্বস্থানে একটানা রঙ মাখিলে কোনো কাজ দিবে না। গাঢ় রঙের রেখায় মুখের আকৃতিকে বিকৃত করাই হইল আসল কথা। আমাদের দেশের গ্রামে 'মসিনার' কাল রঙ সহজপ্রাপ্য ; আমরা এই রঙকে কাজে লাগাইতে পারি। সুধু উড়ো জাহাজের সম্মুখে

নহে, অন্ধকারে চলাফেরা করার পক্ষে মুখ ও হাত কালো রঙে বিকৃত করিয়া রাখাই শ্রেয়।

বাঙলা দেশের গ্রাম অঞ্চলে যাতায়াতের সময় বন বা ঝোপের পিছনে সহজেই আড়াল মিলিবে অবশ্যই। কিন্তু বাঙলার গ্রামের মাঝে মাঝে বিশাল ক্ষেত পড়িয়া আছে। এই ক্ষেত অতিক্রম করিবার সময় শত্রুর উড়োজাহাজ আমাদের বিপদে ফেলিতে পারে। মাঠের মধ্যপথে যদি শত্রু-বিমান আসিয়া পড়ে তবে গরিলাদের প্রথম কাজ হইবে ছড়াইয়া শুইয়া পড়া। শুইবার সময় আমরা কখনও এমনভাবে শুইব না যাহাতে উপর হইতে মানুষের দেহের আকৃতি স্পষ্ট দেখা যায়। অর্থাৎ হাত পা গুটাইয়া এমনভাবে শুইব যাহাতে উপর হইতে মাঠের মাঝে কৃষকের ফসলের বস্তা বা আটি পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে চাষীরা চাষের পূর্বে গরুর গাড়ী করিয়া কালো রঙের সার আনিয়া মাঠের মাঝে মাঝে স্তূপাকার করিয়া রাখে। বিপদের ঝুঁকি লইয়া যদি গরিলাদল তৎপরতা সহকারে একজনের পর আরেকজন শুইয়া ঐরূপ গোলাকার স্তূপের মতো পড়িয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে বোমারু চালককে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন হইবে না। তবে শত্রু যদি কোনো মতে সন্ধান পায় তবে ইহাতে গুরুতর বিপদ আছে। কারণ এক বোমার আঘাতেই সকলকে একসঙ্গে মরিতে হইবে। ইহা ছাড়া মাঠের মাঝে মাঝে যে ঝোপের সন্ধান

মিলিবে তাহার আড়াল লওয়া যাইতে পারে। তবে আড়াল লইবার সময় আমরা যেন খেয়াল রাখি, শত্রু উপর দিকে—তাহাকেই আমার ধোঁকা দিতে হইবে।

গরিলা-যোদ্ধার পক্ষে আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায় হইবে তাহাদের সঙ্গে একখানা ছোট হাল্কা সবুজ রঙের কাপড় রাখা। ঝোপের আড়ালে হউক খোলা মাঠে হউক, চাষ করা জমির আলের উপর হউক—বাঙলার যে-কোনো স্থানে এই কাপড়ে নিজেকে ঢাকা দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলে, উড়ো জাহাজ কেন, যে-কোনো চলতি যান হইতে আমাদের খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে।

(২) আত্মগোপন করিতে না পারিলে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখা দেয়। কী করিয়া গোলা-গুলীর সম্মুখে আশ্রয় লইতে হয় তাহা আমরা পূর্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। এক কথায় শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লয়, আমাদেরও তেমনি করিয়া মাটির আশ্রয় লইতে হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের একজন জার্মাণ সৈনিক তাঁহার আত্মচরিতে উচ্ছ্বাসভরে লিখিয়াছিলেন, "কে জানিত মাটি-মায়ের কোলে এত নিরাপদ আশ্রয় মিলিতে পারে! মাটিকে ইহার আগে কখনও এত ভালবাসিতে শিখি নাই।" আমাদের মাটি কামড়াইয়া পড়িতে হইবে। বাঙলার মাঠে ঘাটে, গর্ত, নালা এবং উঁচু নীচু ঢালুর অভাব নাই। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের পড়িয়া থাকিতে হইবে।

গরিলাদলের বিরুদ্ধে জাপানী হাওয়াই জাহাজ বেশির ভাগ সময়ে বোমা নিক্ষেপ করিতে চাহিবে না। কারণ খরচে পোষাইবে না। বিশাল প্রান্তর ও ছোট্ট দল—ইহাই তাহাদের অসুবিধায় ফেলিবে। ছোট্ট দলকে প্রথম খুঁজিয়া পাওয়া দায় এবং পাইলেও লক্ষ্যভেদ করা কঠিন। ২০০৷৩০০ মাইল বেগে ধাবমান বোমারু হইতে স্বল্প পরিসর স্থানে গোলা তাক্ করিলে দশটির পর একটি লাগিতে পারে। আবার তাহা লাগিলেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গরিলাদের মধ্যে মাত্র একজন হয়ত মারা পড়িবে। কাজেই খরচে পোষাইবে না। জাপানীরা গরিলার বিরুদ্ধে সাধারণত মেসিনগান চালাইবে। ছোঁ মারিবার মতো হঠাৎ নামিয়া আসিয়া গুলির ঝাঁকে তাহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে চাহিবে। ইহার বিরুদ্ধে আশ্রয় লইবার সময় আমাদের প্রথম অনুমান করিয়া লইতে হইবে, শত্রুর বিমান কোনদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া ছোঁ মারিতে পারে। যেমন বনের ভিতর কোনো রাস্তার উপর ছোঁ মারিয়া মেসিনগান চালাইতে হইলে, রাস্তা বরাবর তাহাকে নীচু হইয়া আসিতে হইবে। সেইদিক অনুমান করিবার পর আমরা এমন গর্তে বা নালায় আশ্রয় লইব যে, নালার উঁচু মাটি যেদিক হইতে বিমান আসিবে সেইদিকে আছে। কারণ বিমান হইতে যে-গুলী আসিবে তাহা খাড়াই আসিয়া বিদ্ধ হইবে না, তাহা কাৎ হইয়া উপর হইতে ক্রমশ নীচু হইয়া তীর্যক (তেরসা) ভাবে আসিবে। এইজন্য ইহার

সম্মুখে গর্ত অপেক্ষা সুবিধামতো উঁচু স্থান পাইলে সহজেই রেহাই পাওয়া যাইতে পারে।

আক্রমণের প্রশ্ন

(১) শত্রুর অধুনাতম সর্বনাশী বিমান-শক্তির সম্মুখে আমাদের নগণ্য অস্ত্র লইয়া আত্মরক্ষার প্রশ্নই বেশি করিয়া ভাবিতে হইবে। তবুও আমরা মাটিতে, আর শত্রু হাওয়ায় দোদুল্যমান,—ইহার জন্য তাহারা সামান্য কারণেও সময় সময় বিপদগ্রস্ত হইতে বাধ্য। এই দুর্বলতার সুযোগে স্থানে স্থানে আমাদের আক্রমণমুখী হইতে হইবে। বোমারুরা সাধারণত অনেক উপর হইতেই বোমা ফেলিতে পারে। কাজেই তাহার সহিত আমাদের যুঝিতে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু 'ফাইটার' বিমান মেসিনগান চালাইয়া যদি আমাদের মারিতে আসে তবে তাহাকে নিম্নগামী হইয়া ছোঁ মারিতে হইবে। গরিলাদল যদি কখনও মাঠের মাঝে বা রাস্তার মাঝে ইহাদের হাত হইতে পালাইবার সুযোগ হারাইয়া ফেলে, তবে তাহাদের মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া মাটির আশ্রয় হইতে আক্রমণ চালানো ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না। বিমানের মতো মারণ-যন্ত্রও রাইফেলের গুলীতে কাবু হইতে পারে। যুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেও ইহার নজির যথেষ্ট মিলিবে। দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধ যখন পেগুর পূর্বে সিটাং নদীর কূলে চলিতেছিল তখন একজন ভারতীয়

শত্রুবিমান ছোঁ মারিয়া বোমা ফেলিবার জন্য উঁচু নীচু ঢেউ খেলিয়া আসিবার কালে গরিলা রাইফেলবাহিনীর ছোট ছোট দল বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইয়া কোন দল কখন বিমানকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িবে তাহা এই ছবিতে দেখানো হইয়াছে। পৃঃ ১২৫

সৈন্য একটি রাইফেলের গুলী চালাইয়া একখানি জাপানী বিমান ভূপাতিত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

কার্যত দেখা গিয়াছে, কোনো উড়োজাহাজ যখন ৩০০ গজের অধিক উপরে থাকে, তখন গুলী খরচ করিয়া লাভ নাই। তবে সৈন্যবাহী উড়োজাহাজ অল্পেতে ধ্বংস হয় বলিয়া ৬০০ গজের মধ্যে পাইলেই গুলী মারার চেষ্টা করা উচিত। বোমারু বা গুলী-চালক (ফাইটার) বিমান যখন সোজা মাটির সমান্তরাল বেগে ছুটিতে থাকে তখন তাক্ করিয়া লাভ নাই। কেননা, উহাদের গতি সাধারণত ৩০০ মাইল। এত দ্রুতগতিসম্পন্ন লক্ষ্যকে ভেদ করা কী কঠিন তাহা যাহারা উড়ো পাখী মারিতে অভ্যস্ত তাহাদের জানা আছে। প্রথমেই যেদিক বরাবর বিমান ছোঁ মারিবে সেই লাইন ধরিয়া দু-তিনটি ছোট ছোট দলে গরিলাদিগকে কিছুদূর অন্তর অন্তর মাটির আশ্রয়ে প্রস্তুত হইতে হইবে। ছোঁ মারিবার উদ্দেশ্যে বিমানগুলি ঢেউ খেলিয়া উঁচু নীচু হইবার সময় দেখা যায়, তাহারা কোনো কোনো বিন্দুতে আমার গুলীর সোজা লাইন ক্রস বা অতিক্রম না করিয়া সেই লাইন বরাবর কিছুটা সময় নামিতে থাকে বা উঠিতে থাকে। ইহাই বিমানকে গুলী করিবার সুযোগ ও সময়। আমাদের গুলীর লক্ষ্য হইবে বিমানের দেহকে, পাখাকে নয়। গুলী করিবার

অল্পপূর্ব হইতে বন্দুকের নালাকে লক্ষ্য করিয়া বিমানের সঙ্গে সঙ্গে সরাইতে থাকিতে হইবে এবং ট্রিগার টানিবার সময়ে এবং পরেও যেন বন্দুকের নালা বিমানকে অনুসরণ করিতে থাকে। বিমান যদি খুব নিকটে আসে তবে ইহার নাক বরাবর বন্দুকের গুলী চালাইতে হইবে। যদি দূরে থাকে তবে নাকেরও কিছুটা আগে লক্ষ্য করা দরকার।

(২) উড়োজাহাজকে নূতন এক কৌশলের জন্য প্রয়োগ করা হইতেছে। অবশ্য লালফৌজই ইহার আবিষ্কারক। সৈন্যরা যখন সম্মুখ-রণে ব্যস্ত তখন হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত শত্রু-পক্ষের ছোট ছোট দল বিমানসাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে নামিয়া বিশৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করে। এই দলগুলি প্যারাসুট সাহায্যে আকাশ হইতে নামিতে থাকে। আভাষ পাইবা মাত্র গরিলাদল প্রস্তুত হইতে পারিলে ইহাদের খতম করা অতি সহজ। কারণ ছাতা মেলিয়া ইহারা যখন শূন্যে দুলিতে থাকে তখন গুলীর দ্বারা ছাতা ফুটা করিয়া দিলেই ইহারা ঝুপ ঝুপ করিয়া পড়িয়া মরে। কিন্তু হল্যাণ্ডের যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, জার্মাণরা এষ্‌নার (Eshner) নামে এক প্যারাসুট ব্যবহার করিয়াছে ; ইহার সাহায্যে বিমান হইতে মাটিতে নামিতে মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড লাগে। কাজেই ছাতা বিদ্ধ করিয়া ইহাদের মারিবার অবকাশ মিলিবে না। তবে পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে মাটিতে পৌঁছানো মাত্র ইহাদের খতম করা যায়।

যতই দ্রুত ইহারা নামিয়া আসুক না-কেন, মাটিতে আশ্রয় লইয়া অস্ত্রধারণ করিতে করিতে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি বা গুলীর ঝাঁকে বিদ্ধ করিতে পারি।

(৩) বাঙলা নদীনালার দেশ বলিয়া জাপানীরা এখানে এক অপচেষ্টা করিতে পারে। সমুদ্রগামী বিমানে (sea plane) ইহারা সোজা নদীর বুকে নামিয়া রবার-বোটের সাহায্যে ছোট ছোট দলকে দুই তীরে ছড়াইয়া দিতে পারে। প্রশস্ত নদীর বুক হইতে রবার-বোটে চাপিয়া সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ভাবেই তীরের দিকে ইহাদিগকে ধীরে ধীরে আসিতে হইবে। কাজেই তৎপর গরিলাদলের সম্মুখে ইহারা-যে কীভাবে নাস্তানাবুদ হইতে পারে, তাহা নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই।

গরিলা-যোদ্ধাদের সর্বসময়ে শত্রু-বিমানের চলাফেরার দিকে নজর রাখিতে হইবে। বিমানের আনাগোনা সম্বন্ধে সজাগ থাকা খানিকটা সোজা। ইহারা শব্দ না করিয়া চলিতে পারে না। ইহাই ইহাদের অন্যতম দুর্বলতা। কিন্তু গরিলা-যোদ্ধারা যেন একটা কথা জানিয়া রাখে যে, বর্তমানে বিমান চালকেরা এক অভিনব কৌশল লইতেছে। ইহারা গন্তব্যস্থানের ১০০ মাইল দূরে খুব উঁচুতে উঠে। সেখান হইতে হাত পা ছাড়িয়া দিবার মতন মেসিন বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে (gliding) ভাসিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। এমন অতর্কিত আক্রমণ বড় মারাত্মক।

"Gliding long distances is possible and it is estimated that by reaching high altitudes and gliding after closing the machine a distance of even 100 miles could be covered. Sirens & sound detectors could be deceived and anti-aircraft batteries would never come into action."—L. M. Chitale (Air Raids and Civil Defence.)

লালফৌজ ফিনল্যাণ্ডে আগের যুদ্ধে এই উপায়ে শত্রুর বহু ক্ষতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাপানীরা এ পন্থা গ্রহণ করিতেছে কিনা, তাহা অবশ্য জানা যায় নাই।

(৭)

নদী-যুদ্ধে ও জঙ্গল-যুদ্ধে গরিলার সুবিধা

জাপানী শত্রুরা সাঁ-সাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কে তাহাকে রুখিবে ? বাঙলার প্রতি গৃহ হইতে, ভারতের প্রতি গ্রাম, প্রতি নগর হইতে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা তাহাকে রুখিব। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চিরকাল ভারতবাসীর নিরস্ত্র হস্ত বজ্রমুষ্টিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবার কি তাহার সশস্ত্র হস্ত জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে শত্রুরক্তে সিক্ত হইবার জন্য উদ্যত হইবে না ? উদ্যত হইবে বলিয়াই সে আজ উন্নত স্বরে দাবী জানাইতেছে—অস্ত্র চাই, রাইফেল চাই, বন্দুক চাই। সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই অস্ত্রধারণের পূর্বে বাঙলার প্রতি গরিলা-যোদ্ধার জানিয়া রাখা আবশ্যক—বাঙলার বুকে কীরূপে ও কীভাবে যুদ্ধ দেখা দিবে। বাঙলার নদীর কূলে, বাঙলার প্রান্তরে, বাঙলার জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে দস্যুরা কী ধরণে ও কী ধারায় প্রবেশ করিবে তাহা জানিয়া রাখা ভালো। কিন্তু শত্রু আজ গৃহদ্বারে, এখন প্রকাশ্যে বাঙলা দেশের বিশেষত্বগুলির উপর আবশ্যকমতো আলোকপাত করা উচিত হইবে না। তবে

বাঙলা নদীবহুল দেশ এবং দক্ষিণ বঙ্গের গ্রামগুলিতে প্রায় জঙ্গল-যুদ্ধই দেখা দিবে। সেইদিক হইতে নদী ও জঙ্গল সর্বদেশে যুদ্ধের গতিকে কীভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহা আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

নদী-যুদ্ধ

সকল দেশেই নদীর গতি খুব আকাবাঁকা হইলেও গোটা নদীকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ইহার ধারা শেষ পর্যন্ত একটা বিশেষ দিক লইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে। নদীর গতি-পথ রণক্ষেত্রের পাশাপাশি থাকিয়া বা সোজাসুজি অতিক্রম করিয়া নানাভাবে সৈন্যের অগ্রগতি বা আত্মরক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ-মহড়ায় যখন সৈন্যেরা সার বাঁধিয়া দাঁড়ায় তখন তাহারা নদীকে দুই প্রকারে কাজে লাগাইতে পারে।

(ক) প্রথম শত্রুকে অপর পারে ফেলিয়া এপারে নদীর তীর বরাবর সৈন্যকে দাঁড় করানো যাইতে পারে। অর্থাৎ নদীকে শত্রু ও আমাদের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে আগল বা বাধা দিবার কাজে লাগানো যাইতে পারে। নদী যদি বিস্তীর্ণ এবং খরস্রোতা হয় তবে ইহা উত্তম প্রাকৃতিক বাধা। খুব উঁচু পাহাড়ের মতো দুরতিক্রম্য না হইলেও ইহা শত্রুকে আমাদের বন্দুকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। গ্রাম বা জঙ্গল-যুদ্ধে শত্রুরা আমাদের অলক্ষ্যে এপাশ ওপাশ দিয়া পশ্চাতে বা পার্শ্বে অগ্রসর হইয়া

আমাদিগকে বিপদে ফেলিতে পারে; এবং প্রান্তরেও পরিখার আশ্রয় ও ট্যাঙ্কের আশ্রয় লইয়া রাত্রের অন্ধকারে শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু নদীকে মধ্যস্থলে ফেলিতে পারিলে শত্রুর পক্ষে মাটি ছাড়িয়া বিনা ট্যাঙ্কে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়া অতিক্রম করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। ইহার ফলে অবারিত লক্ষ্যপথে পাইয়া তাহাদের নিঃশেষ করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন বর্তমান যুদ্ধে অল্প গোটা-কয়েক সৈন্য লইয়া কারবার চলে না। লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে এই উন্মুক্ত স্থানে পারাপার করাইতে হইবে। তাহার জন্য পূর্ব হইতে রীতিমতো সুদৃঢ় সেতু নির্মাণ আবশ্যক। এই নির্মাণকার্য একই সময়ে সর্বস্থানে করা সম্ভব নহে এবং করিতেও সময় লাগে; ফলে শত্রুরা মাত্র বিশেষ কয়েকটি সুবিধামতো স্থানে নদী পার হইবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। অপর পক্ষে আত্মরক্ষাকারীরা নদীর এপারে সৈন্য চালনা করিয়া শত্রুর কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে পারাপারের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। দেশে দেশে দেখা গিয়াছে নদীর কূলেই মানুষের বসবাস বেশি। এই লোক বসতির জন্য নদীর পাশেও সৈন্য চালনা করিবার মতো যথেষ্ট রাস্তাঘাট পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, নদীর এক তীর অপেক্ষা অন্য তীর কিছু উঁচু থাকেই; আত্মরক্ষাকারীরা উঁচু তীরে আশ্রয় লইতে পারিলে শত্রুর অলক্ষ্যে তাহাদের সৈন্য চালনা সহজ হইয়া আসে।

এই ভাবে নদীকে মামুলী যুদ্ধ-ব্যবস্থায় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক বাধা হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ-পদ্ধতিতে নদীর বাধা অতি নগণ্য। শত্রুর হাতে যদি বোমারুর আধিপত্য থাকে তবে শত্রুকে নদী অতিক্রমে বাধা দিতে যাওয়া দুরূহ সমস্যা। দ্বিতীয়ত, শত্রুরা বীজক্ষেপ-নীতি বা সূচিভেদ-নীতি (infiltration) অনুযায়ী হাজার পথে ও হাজার স্থানে ছোট ছোট দলকে বিপক্ষ-বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আপন দায়িত্ব দিয়া ছাড়িয়া দেয়। মালয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এই ছোট ছোট জাপানী দল স্থানে অস্থানে সাঁতরাইয়া মিত্রপক্ষের ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছে। হয়ত ইহাদের অনেক ছোট দল নদীর বুকে উন্মুক্ত হওয়াতে মিত্র-পক্ষের গুলীতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু মরিতে মরিতে যে কয়েকটি দল নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছে তাহারাই মিত্রপক্ষের মহড়ায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(খ) দ্বিতীয়, নদীকে বাধারূপে ব্যবহার না করিয়া রসদ যাতায়াতের বা সৈন্য চালনার কাজে লাগানো যাইতে পারে। নদীর গতি যখন সম্মুখ-মহড়ার বরাবর সমান্তরালভাবে রাখা যায় তখন দীর্ঘ মহড়া ধরিয়া ডানদিকে বা বামদিকে ইচ্ছামতো রসদ ও সৈন্য নদীর সাহায্যে আনা-গোনা করা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দীর্ঘ লাইন ধরিয়া সৈন্যরা ছড়াইয়া যায় তখন

তাহাদের সময়মতো আহার ও গোলা-গুলী পৌছানো এক গুরুতর সমস্যা। কাজেই নদীকে এই লাইনের পশ্চাতে সমান্তরালভাবে রাখিতে পারিলে এই সমস্যার সহজ সমাধান ঘটে। কিন্তু দুর্দান্ত শত্রুর অগ্রগতির সম্মুখে এইভাবে সমাধান করিতে যাওয়ায় সমূহ বিপদ আছে। শত্রুবাহিনীর কোনো বাহু যদি আত্মরক্ষাকারীর লাইন ভেদ করিয়া একবার নদী অতিক্রম করিতে পারে, তবে এই খণ্ডিত লাইনের হয় বাম অংশ, না-হয় দক্ষিণ অংশ পশ্চাতের হেড-কোয়ার্টারের যোগাযোগ হারাইয়া ফেলে। এই সুবিধার জন্যই জাপানীরা দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে টাঙ্গু নদীর বরাবর দাঁড় করাইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। কারণ তাহারা জানিত তাহাদের সূচিভেদ-নীতির (infiltration) সাহায্যে মিত্রপক্ষের ব্যূহ ছিদ্র করিয়া টাঙ্গু নদী বরাবর লাইনকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে। সেনাপতি ওয়াভেল ব্রহ্ম যুদ্ধের বিশ্লেষণে এই কথাই বলিয়াছেন। নদীবহুল বাঙলা দেশে জাপানীরা হয়ত ব্রহ্ম যুদ্ধের কৌশলই অনুসরণ করিতে চাহিবে ; অর্থাৎ যাহাতে মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী নদীর সমান্তরালভাবে দাঁড়াইতে বাধ্য হয় তাহার চেষ্টা করিবে।

নদীর ধারাগুলি যদি পশ্চাৎ হইতে সোজাসুজি আসিয়া রণাঙ্গনের সম্মুখ লাইন ভেদ করিয়া বহিয়া যায় তবে নদীকে যাতায়াতের কাজে ভালোভাবে ও নিরাপদে ব্যবহার করা

যাইতে পারে ;—বিশেষ করিয়া যদি অনেকগুলি নদীর ধারা পাশাপাশি হইয়া রণাঙ্গনের দিকে প্রবাহিত হয়। রেল-লাইন বা রাস্তা অপেক্ষা নদী এই বিশেষ অবস্থায় অধিক সাহায্য করে। কারণ বর্তমানে—বোমারুর দিনে—মহড়ার পশ্চাতের রেল-লাইন ও রাস্তা ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু বোমার আঘাতে নদীপথকে অবরুদ্ধ করা বা ভাঙিয়া ফেলা যায় না। নদীপ্রধান দক্ষিণ বঙ্গের যুদ্ধে এই প্রথায় নদ-নদীকে কাজে লাগনোই সমীচীন হইবে।

নদীর স্রোত বর্তমানে শত্রুর অগ্রগতির সম্মুখে বিশেষ বাধা না হইলেও এই স্রোতগুলি যদি অসংখ্য ধারায় দেশকে জালের মতো ছাইয়া থাকে তবে তাহা শত্রুকে সম্পূর্ণ ব্যাহত না করিলেও তাহার অগ্রগতিকে বিশেষভাবে মন্থর করিয়া তুলিবে। ইহা ভিন্ন, পথবিহীন গভীর অরণ্য যেমন গরিলা-বাহিনীর পক্ষে শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণে বিহ্বল করিয়া পালাইবার সুযোগ দেয়, তেমনি বাঙলার তটভূমিতে অসংখ্য নদীর ধারাগুলি অজস্র পথের সৃষ্টি করিয়া বাঙলার গরিলা-বাহিনীর পক্ষে শত্রুকে অজানিত পথে আক্রমণ করিয়া অপ্রত্যাশিত পথে উধাও হইতে প্রচুর সাহায্য করিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এপর্যন্ত যতগুলি যুদ্ধের নজির মেলে তাহা কোথাও বাঙলার মতো নদীবহুল দেশে ঘটিতে দেখা যায় নাই। ভবিষ্যতে বাঙালী গরিলা-যোদ্ধার দায়িত্ব রহিয়াছে—কীভাবে

তাহারা নদীর এই অসংখ্য ধারাগুলির সাহায্যে সহস্র গুপ্ত সর্পের মতো সহস্র ফণার দংশনে জাপানী দস্যুকে ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য উদ্যত হইবে।

জঙ্গল-যুদ্ধ

ঘন বন যোদ্ধাদের যে-সুবিধা বা অসুবিধায় ফেলে, জঙলা দেশ বা গ্রাম প্রায় অনুরূপভাবে সৈন্যের অগ্রগতিতে বাধা ও সুযোগ দেয়। দক্ষিণ বঙ্গে রাঙামাটি হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত যেমন নিবিড় বনের অভাব নাই, তেমনি সামান্য আবাদ-অঞ্চল ভিন্ন সারা বাঙলা জঙলা গ্রামে আবৃত। কাজেই আমাদের জঙ্গল-যুদ্ধের রীতিকে সাধারণভাবে জানিয়া রাখা ভালো।

(১) প্রথম, বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের সকল যন্ত্রপাতিই জঙ্গল-যুদ্ধে প্রায় অকেজো হইয়া পড়ে। ট্যাঙ্ক অবশ্য ছোট ছোট গাছপালা ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু ইহাকে যদি প্রতি পদে এই ভাঙিবার কাজে লাগিতে হয়, তবে ইহাকে সম্মুখে থাকিয়া সৈন্যদলের অগ্রগতিকে দ্রুত ও নিরাপদ করা অপেক্ষা সৈন্যদলের পশ্চাতে পড়িয়া অনুগামী হইতে হইবে। সৈন্যদলকে সাহায্য করার কথা দূরে থাকুক, সৈন্যদলের সাহায্যে ইহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইহা ভিন্ন জঙলা-দেশের মাটি যদি বাঙলার মতো নরম ও কর্দমাক্ত হয়, তবে তাহা রুশ রণাঙ্গনের বরফ-গলা কাদার মতো শত্রু-ট্যাঙ্ককে

দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্দী করিতে থাকিবে। বনের মধ্যে ছোট-বড় কামান ও মেসিনগানের কার্যকারিতাও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। এই যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা সুবিধা হইতেছে, বহু দূর হইতে গুলী চালনা করিয়া শত্রুর গতিকে প্রতিরোধ করা। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় শত্রুরা দাঁড়াইয়া আছে বা কোথায় ঘাঁটি করিয়াছে, তাহা দূর হইতে লক্ষ্য করা প্রায় অসম্ভব। ফলে, ঘন গাছপালা যেমন মেসিনগানের গুলীকে অগ্রসর হইতে দেয় না, তেমনি লক্ষ্যের অভাবে অধিকাংশ সময় বড় বড় কামানের গোলাও নিরর্থক ক্ষয় হইয়া যায়। অধুনাতম মারণ-অস্ত্র বোমারু ও উড়োজাহাজও জঙ্গল-যুদ্ধে সৈন্যের মধ্যে বিভীষিকা আনিতে অক্ষম। সৈন্যকে খুঁজিয়া না পাইলে অনর্থক বোমার আঘাতে জঙ্গল ধ্বংস করিয়া লাভ নাই। আমরা অনেকে জানি না যে, বোমারুর পক্ষে সব চেয়ে অসুবিধা হইতেছে, উপর হইতে সৈন্যদলকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সৈন্যদল খোলা মাঠে শুধু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তবে আকাশ হইতে ২।৩ হাজার ফিট উপরে ঘোরাফেরা করিয়াও তাহাদের লক্ষ্য করা দায় ; গাছের আড়াল তো দূরের কথা, যদি গাছের ছায়ায় খোলা মাঠে দাঁড়ানো যায় তবুও উড়োজাহাজ ১,০০০ ফিটের মধ্যে আসিয়াও সৈন্যদলকে চিনিতে বা দেখিতে পারে না। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, জঙলা গ্রামে বা বনে রাস্তাগুলিকে উপর হইতে অতি

সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় ; এবং ট্যাঙ্ক বা কামানগুলি বনের এই রাস্তাগুলিকে বিশেষভাবে কাজে লাগাইতে পারে। সুতরাং জঙ্গল-যুদ্ধে আত্মরক্ষীরা বনের পথঘাটগুলি এড়াইয়া চলিলে যান্ত্রিক যুদ্ধের যন্ত্রকে ফাঁকি দিতে পারিবে।

(২) জঙ্গল-যুদ্ধে শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণে (Surprise) হতভম্ব করার যেমন সুযোগ মেলে এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। জঙলা গ্রামে অধিকাংশস্থলে ১০০।২০০ গজের দূরে দৃষ্টি যায় না। খোলা মাঠে যখন যুদ্ধ চলে, বড় কামানগুলি তো ১৫।১৬ মাইল দূর হইতেই গোলা চালাইতে আরম্ভ করে এবং ২।৩ মাইল হইতে মেসিনগানের অজস্র গুলীর ঝাঁক শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করিতে থাকে। কিন্তু বনের মধ্যে হয়ত হঠাৎ শত্রুরা অলক্ষ্যে ৫০ গজের মধ্যে আসিয়া হাজির হইতেও পারে। এই হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ থাকাতে জঙ্গল-যুদ্ধে যে-দল আক্রমণমুখী হইতে পারে সেই দলই লাভবান হয়। আটঘাঁটি বাঁধিয়া আত্মরক্ষায় নিশ্চিন্ত থাকা জঙ্গল-যুদ্ধে কখনই সম্ভব নয়।

(৩) ফ্রেডারিক বা নেপোলিয়ান হইতে গত মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) পর্যন্ত সেনাপতিরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কীভাবে লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে একত্রে ও সমতালে রণাঙ্গনে সুশৃঙ্খল ভাবে আগু-পিছু করাইয়া শত্রুর সৈন্যদলকে ঘেরাও বা ছিন্নভিন্ন করা যায়। এই সংগঠনে

প্রত্যেকটি ছোট সৈন্যদল তাহার পার্শ্ববর্তী সৈন্যদলের সহিত সমতালে ও সহযোগে এবং পশ্চাতের ঘাঁটির সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলাফেরা করিতে আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই শৃঙ্খলা বা বন্ধনের ফলে লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে একটি মোট মতলব বা প্ল্যান হাসিল্ করিবার কাজে লাগানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু জঙ্গল-যুদ্ধে বনের ও ঝোপের অভ্যন্তরে এই শৃঙ্খলা বা সমতাল রাখা সম্ভব হয় না। কারণ এ-গ্রামের সৈন্যেরা দেখিতে পায় না, ও-গ্রামের সৈন্যেরা কতখানি অগ্রসর হইল বা পশ্চাতে হটিল। রাস্তাঘাটের অভাবে খবরাখবরের দ্রুত আদান-প্রদান সম্ভব হয় না। ইহার জন্য যে-সৈন্যদল সুশৃঙ্খলার সহিত যোগাযোগ রাখিয়া যুদ্ধ করিতে শিক্ষিত হইয়াছে তাহারা জঙ্গল-যুদ্ধে তাল হারাইয়া ফেলে। মালয় যুদ্ধের বর্ণনা করিতে গিয়া সেনাপতি ওয়াভেল জানাইয়াছিলেন যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যরা জঙ্গল-যুদ্ধে অভ্যস্ত নয়। ইহার অর্থ আর কিছু নয়, মিত্রপক্ষের সৈন্যের মনের গঠন ও পল্টনের সংগঠন এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা লোহার শিকলের মতো পরস্পরে আবদ্ধ ও সংযুক্ত না থাকিলে সাহস ও ভরসা হারাইয়া ফেলে। অপর পক্ষে এবারের যুদ্ধে নাৎসীরা ব্লীজক্রীগ বা সূচিভেদ-নীতি (infiltration) অনুসারে তাহাদের সৈন্যদিগকে ছোট ছোট অজস্র দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে প্রতিটি আধুনিক

অস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার বাধ্যকতা না রাখিয়া এককভাবে শত্রু-ব্যূহে প্রবেশ করিবার আদেশ দিয়াছে। এই নীতিতে ২০০।৩০০ সংখ্যার এক দলের হাতে হয়ত কিছু ট্যাঙ্ক, বোমারু, আমার্ড গাড়ী প্রভৃতি অস্ত্র দিয়া বলা হইয়াছে, তোমরা যে-ভাবে পারো শত্রুর মহড়ার পশ্চাতে বিদ্ধ হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই; অবশিষ্ট দলগুলি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে অভ্যস্ত শত্রুদলের যোগাযোগ ছিন্ন করিতে সক্ষম হইবে এবং ইহাতে শত্রুরা দিশাহারা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবে। জাপানীরাও এই নীতি প্রতি স্থানে অনুসরণ করিতেছে। জঙ্গল-যুদ্ধে এই নীতি অতি কার্যকরী। কাজেই বাঙলাতেও জাপানীরা পেগু ইয়োমার জঙ্গল-যুদ্ধের মতো অসংখ্য ছোট ছোট দলে গ্রাম ও বন ছাইয়া ফেলিবে। ইহা ছাড়াও আরেকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। খোলা মাঠের যুদ্ধে যে-সৈন্য-সংখ্যা দিয়া আত্মরক্ষার ব্যূহ প্রশস্ত (deep) করা সম্ভব হয়, জঙ্গলে তাহা করিতে অনেক বেশি সৈন্য আবশ্যক; কারণ, এখানে পরস্পরের যোগাযোগ বজায় রাখিতে সম্মুখ-মহড়ায় অত্যন্ত ঘন ঘন করিয়া সৈন্য ছড়াইতে হয়। ফলে, আত্মরক্ষার ব্যূহ ক্ষীণ হইয়া আসে। সম্মুখ-মহড়া যদি ক্ষীণ বা অপ্রশস্ত হয়, তবে সূচিভেদ-নীতি আরও কার্যকরী হয়। কারণ, দুই-

এক মাইল ঢুকিতে পারিলেই অপর পক্ষের পশ্চাতে পোঁছাইয়া বিভ্রাট ঘটানো সম্ভবপর।

(৪) জঙ্গল-যুদ্ধে সাধারণ সৈন্য অপেক্ষা সংবাদ সংগ্রহকারী প্রহরী-সৈন্যের কার্যাবলীই বড় কথা। হাতে যতই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র থাকুক না-কেন, বনের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় শত্রু-সৈন্য আছে, কোথায় রাস্তাঘাট আছে, এসব জানা না থাকিলে সৈন্যদলেরা কাজ অপেক্ষা অকাজই বেশি করিয়া বসিতে পারে। সেইজন্য বনের মধ্যে দুর্ধর্ষ সাহসী ও তীক্ষ্ণ প্রহরী সৈন্যের একান্ত আবশ্যক। ইহাদের সামান্য একটি খবরে হয়ত হঠাৎ আক্রমণে বিশাল শত্রুসৈন্যকে বিহ্বল করা যায়। দক্ষিণ বঙ্গের আগামী যুদ্ধে স্থানীয় গরিলা-সৈন্যেরা এই কার্যে স্থায়ী-সৈন্যদলকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে।

(৫) দুর্ধর্ষ ও বিশাল জাপ-সৈন্যবাহিনী দেখিয়া আমাদের হতাশ হইবার কিছু নাই। ইহাদের বড় জাহাজ আছে, বড় কামান আছে, বড় ট্যাঙ্ক আছে, বড় ও অজস্র বোমারু ও মেসিনগান আছে ; থাকুক, বাঙলার কর্দমাক্ত মাটিতে যদি তাহাদের নামিতে হয়, তবে এই সুন্দরবনে, রাঙামাটির অরণ্যে, দক্ষিণ বঙ্গের জঙলাগ্রামে তাহাদের সে-অস্ত্র ও বর্ম ফেলিয়া জাভার যুদ্ধের মতো এখানেও তাহাদের প্রায় নগ্ন দেহে ও নগ্ন পায়ে রাইফেল-হাতে ছোট ছোট দলে প্রবেশ করিতে হইবে। শত্রুরা অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত, অসংখ্য গুলী তাহাদের হাতে, এবং

মালয় জাভা ও ব্রহ্ম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের পশ্চাতে। আমরা বাঙলার গরিলাদল তেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করি নাই সত্য, অসংখ্য গুলী ও অস্ত্রও হয়ত আমাদের হাতে নাই সত্য; কিন্তু আমরাও যেমন ছোট ছোট দলে ছড়াইয়া আছি, শত্রুরাও তেমনি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইবে। শত্রুর সংখ্যা নির্দিষ্ট, আমাদের সংখ্যা অসংখ্য। শত্রুকে পথ চলিতে, গ্রাম চিনিতে, নদীর গতি বুঝিতে পুস্তক খুলিতে হইবে, কম্পাস দেখিতে হইবে; আমরা আমাদের দেশকে অণুপরমাণুতে চিনি; ইহার রাস্তা, ইহার নদী, ইহার গ্রাম আমাদের নখদর্পণে। অস্ত্র আমাদের হাতে আজও আসে নাই সত্য; কিন্তু জঙ্গল-যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক—তৎপরতা ও দুর্ধর্ষ সাহস। আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করিবার নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া শত্রুকেই মারিবার যে-তৎপরতা, উৎসাহ ও প্রেরণা দেখাইতে পারিব, তাহার তুলনায় বৈদেশিক শত্রুর হিংসা, জিঘাংসা ও জাতি-বিদ্বেষের উৎসাহ ও উল্লাস অতি নগণ্য বলিয়াই মনে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গরিলাদলের সমস্যা

(১)

রাষ্ট্র ও গরিলাদল

পণ্ডিত জওহরলালের কণ্ঠ হইতে প্রথমে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইল :

Who lives if India perishes ?

সে কণ্ঠ হইতে আহ্বান আসিল, স্বাধীনতার পূজারী ভারত-বাসী তাহার দুইশত বৎসরের জড়তা ও অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া পৌরুষের বীর্যে ও আত্মবিশ্বাসে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলুক —এদেশ আমার, ইহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমারই। বৃটিশ প্রভুদের মনে আজ যদি শুভবুদ্ধি নাই দেখা দেয়, তবুও আমার দেশকে আমাকেই রক্ষা করিতে হইবে। ভীরু কাপুরুষের মতো দায়িত্ব এড়াইবার জন্য আমরা বলিতে দ্বিধা করিতেছি না—এই মাতৃভূমি আমার নয়, এই মাতৃভূমি যেন ইংরাজের ! এই মাটির অন্নে আমরা পালিত হই নাই ! এই মাটির ফসলে আমরা পুষ্ট হই নাই ! এই মায়ের রক্তে আমার দেহের অণু-পরমাণু সিঞ্চিত হয় নাই ! মাতৃগর্ভকে, মাতৃস্তন্যকে অস্বীকার করিবার—কাপুরুষের এই আত্মবঞ্চনাকে বর্বর নাৎসী-প্লাবন এতটুকুও ক্ষমা করিবে না। আসাম,

মাদ্রাজ, সিংহল, চট্টলের পথ ও ভূমি ভারতবাসীরই রক্তে আজ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শত্রুকে-যে ঠেকাইব তাহার অস্ত্র কই!—তাহার শিক্ষা কই! নেতার মুখ হইতে তাহার উত্তর আসিল: স্বাধীনতার যোদ্ধা ভারতবাসী, তোমরা কি বিনা অস্ত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লড়াই করো নাই? চীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমরা কি শত্রুর অস্ত্রে শত্রুকে নিধন করিবার জন্য জনগণকে আহ্বান করিয়া গরিলা যুদ্ধ করিতে পারো না?

এই জন-যুদ্ধ বা গরিলা যুদ্ধের সম্ভাবনা ও কার্যকারিতা লইয়া অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। কিন্তু আমারা কি চীন-যুদ্ধের ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি না? ইহা সত্য যে, বর্তমানে চীনের নবীন রাষ্ট্র দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার হাতে জাপানকে বাধা দিবার মতো বিশাল স্থায়ী (standing) সৈন্যদল গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৭ সাল হইতে চীনের দীর্ঘ প্রান্তরে ইতস্তত যে-গরিলাদলগুলি দেখা গিয়াছিল, কোথাও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অথবা কোথাও তাহারই ভরসায় ও আশ্রয়ে নবীন চীনের স্থায়ী-সৈন্যদল ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানের প্রথম নির্মম আক্রমণের সম্মুখে যদি এই গরিলাদল দুর্ধর্ষ ও দুর্ণিবার সাহসে শত্রুকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া জনগণের মনে দুর্জয় সাহস, আত্মবিশ্বাস ও

মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার প্রেরণা না জাগাইয়া তুলিত—তবে চীনের গত চার বৎসরের নিষ্কলঙ্ক ইতিহাস কীভাবে গড়িয়া উঠিত কে জানে! রুশ-রণাঙ্গনে সেই একই পটভূমি দেখা দিয়াছে। লালফৌজ অমিতবিক্রমে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু ষ্ট্যালিনের আহ্বানে যদি রাশিয়ার আপামর জনগণ অস্ত্রে, বিনা-অস্ত্রে বা শত্রু-অস্ত্রে শত্রুকে নিধন করিবার জন্য সহরে ও গ্রামে, বনে ও জঙ্গলে রুখিয়া না দাঁড়াইত, তবে রণদক্ষ জার্মাণ সৈন্যের তীর্যক বাহু ককেশাস পার হইয়া কোথায় পৌঁছিত কে জানে? রাশিয়ার ও চীনের প্রত্যক্ষ উদাহরণের পরেও যদি কাহারও মনে জন-যুদ্ধ বা গরিলা যুদ্ধ লইয়া এতটুকু সন্দেহ জাগে, তবে লুডেনডফের "The Nation at War" বইখানি পড়িয়া রাখা উচিত। যে-রণকৌশল প্রয়োগ করিয়া জার্মাণ সৈন্যেরা বর্তমানে অদ্ভুত সাফল্য দেখাইতেছে, লুডেনডফ সেই রণকৌশলেরই স্রষ্টা। এই লুডেনডফই প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় অংশে জার্মাণদের প্রায় একমাত্র অধিনায়ক ছিলেন বলিলেই হয়! সেবার যখন জার্মাণদেশ পশ্চিম ও পূর্ব হইতে একই সময়ে একই তালে আক্রান্ত হইল তখন তিনি পরিকল্পনা দিয়াছিলেন যে, জার্মাণসৈন্যরা ইহার যে-কোনো একদিকে পরিপূর্ণভাবে আক্রমণ করিবে এবং অন্য দিকে তখন জনসাধারণের সাহায্যে (People's War) যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ

"A peoples war blazing up all over the country will eventually prevent the victor from reaping the full fruits of his victory."

ইহার পরও হয়ত কেহ কেহ প্রশ্ন করিবেন—ইহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের মূঢ় ও অজ্ঞ চাষী ও মজুরদল কী করিয়া যুদ্ধ করিবে? ইহার উত্তরের জন্য আমাদের চীন বা রাশিয়ার দিকে তাকাইবার আবশ্যকতা নাই। জনগণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলে যে কতখানি মরিয়া ও বেপরোয়া হইয়া উঠিতে পারে সে দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই মিলিবে। একদিন এই দেশেই শিবাজীর অমোঘ আহ্বানে মহারাষ্ট্রের অজ্ঞ ও মূঢ় চাষীর দলই নগ্ন অশ্বপৃষ্ঠে নগ্নদেহে কেবলমাত্র লোহার ফলক উদ্যত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মরিয়া হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। একদিন এই দেশের মাটিতেই সিপাহী যুদ্ধের তাণ্ডবে তাতিয়া তোপের আহ্বানে মধ্য ভারতের নির্জীব নিরালা গ্রামগুলি হইতে আগত হাজার হাজার চাষী সজ্জিত বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে নাই। একদিন এই বাঙলাতেই জোতদার ফৌজদার, মল্ল প্রভৃতি বংশের পূর্বপুরুষেরা প্রতাপাদিত্যের আহ্বানে স্বাধীনতার যুদ্ধে যশোহর নগরে ইছামতী ও যমুনা নদীর স্রোত শত্রুরক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, ভারতের মূঢ় ও অজ্ঞ চাষীর দল কোনোদিনই স্বাধীনতার যুদ্ধে, মুক্তির যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইবে না।

পণ্ডিত নেহেরুর এই আহ্বানে দেশবাসী যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল ; দেশ নূতন উন্মাদনা অনুভব করিল। কিন্তু নেতা দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন ; দুইদিন পরেই বলিয়া বসিলেন,—

Guerrilla warfare requires the aid and assistance of the State and calls for co-ordination between the guerrillas and the armed forces. The primary responsibility for organising such warfare belongs to the State and when the State is anything but national in its outlook its drive and its military technique, the guerrillas are outside the range of practical politics.

অর্থাৎ, গরিলা যুদ্ধ দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয় এবং ইহা করিতে হইলে স্থায়ী-সৈন্যদল ও গরিলা-বাহিনীর সহিত পূর্ণ যোগাযোগ আবশ্যক। গভর্ণমেণ্টেরই যখন দায়িত্ব, তখন সে-গভর্ণমেণ্ট যদি জাতীয় মনোভাবাপন্ন না হন এবং এ-বিষয়ে যদি আন্তরিকতা না দেখান তবে বর্তমানে গরিলা যুদ্ধের কথা তুলিলে অবাস্তবতারই পরিচয় দেওয়া হইবে।

ইহা অতি সহজ কথা, যদি গভর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্য করিতেন তবে জনযুদ্ধের আহ্বানে দেশকে জাগাইয়া তুলিয়া শত্রুকে নিধন করিবার উদ্দেশ্যে গরিলা যুদ্ধ চালাইবার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হওয়া যাইত। আজ যদি সরকার ভারতের স্বাধীনতাকে অবিসম্বাদে স্বীকার করিয়া আমাদের দেশের অধিবাসীদের প্রতি গৃহে বা প্রতি গ্রামে রাইফেল ও হাত-

বোমা পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, তবে গরিলা যুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জওহরলালের মতো নেতাদের কোনো আবশ্যকই ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের গতি অতি নির্মম ও কণ্টকাকীর্ণ। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-যে তেমন সহজে পাওয়া যাইবে না তাহা দিল্লীর আলোচনায় নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের ঘরোয়া বিবাদ মিটুক আর নাই মিটুক, এদিকে জাপান দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যে জাপানের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে। আজ হউক কাল হউক, সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানগুলি বাঙলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং সিংহল শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত হইবে বলিয়া সেনাপতি ওয়াভেল ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলার জেলাগুলি যদি একে একে শত্রুর দ্বারা অধিকৃত হয় তবে আমরা কী করিব? পণ্ডিতজীর মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। উত্তরে বলিয়াছেন,—নিশ্চয় আমরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিত মনে বসিয়া থাকিব না। ভয় ও সঙ্কীর্ণতার সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা শত্রুকে রুখিবই। কিন্তু পন্থা?—পণ্ডিতজীর নিকট হইতে তাহার কোনো জবাব আসে নাই!

দুইটি প্রশ্ন উঠিয়াছে: (১) প্রথম, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন গরিলাবাহিনী সংগঠন করা সম্ভব নহে; (২) দ্বিতীয়, গরিলা যুদ্ধে স্থায়ী-সৈন্যদল এবং গরিলাবাহিনীর সহিত পূর্ণ যোগাযোগ ও পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক।

রাষ্ট্র ও গরিলাদল

(১) সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস লক্ষ্য করিলে এই উপপাদ্যই সত্য বলিয়া মনে হইবে। ১৯১৮-২২ সালের গৃহ-যুদ্ধে যখন ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি একই মতলবে দলে দলে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য (white army) পাঠাইতেছিল, তখন লালফৌজ অল্প-বিস্তর গরিলা-নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় রুশ-রাষ্ট্র সাম্যবাদীরা দখল করিয়াছে। লেনিন রাষ্ট্রীয় শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সম্ভবমতো অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করিয়া জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবারও রুশ অধিবাসীরা-যে গরিলা যুদ্ধে জার্মাণ সৈন্যদলকে নিদারুণভাবে বিব্রত ও ক্ষত-বিক্ষত করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় শক্তি। সে দেশে প্রতিটি সক্ষম অধিবাসীর হাতে রাষ্ট্র হইতে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সময় সময় জার্মাণ-ব্যূহের পশ্চাতেও উড়োজাহাজের সাহায্যে অস্ত্র ও রসদ জনসাধারণের হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা দেখিয়া স্বভাবতই মনে হইতে পারে যে, প্রথম হইতেই স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে গরিলা যুদ্ধের কথা ভাবা অবাস্তবতার পরিচয়।

কিন্তু রাশিয়ার মতো আমাদের দেশে সরকার ও জনসাধারণের অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকিলে তো কথাই ছিল না। কাজেই এ-প্রশ্নে সে-দেশের কথা তুলিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে যদি কোনো দেশ হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিবার থাকে তবে

তাহা চীন দেশ। প্রথমেই একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শত্রু যে-লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইয়া আসে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গরিলা যুদ্ধ চালানো কখনই সম্ভব নয়। গরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্র হইল শত্রু-ব্যূহের পশ্চাতে। ইহাই যদি হয়, তবে সহজে বুঝা যাইবে যে, কোনও স্থায়ী-সৈন্যদল বা রাষ্ট্রের পক্ষে শত্রু-ব্যূহের পশ্চাতে অবস্থিত গরিলাদলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দায়। হয়ত সময় সময় কিছু কিছু সাহায্য ও উপদেশ পাঠানো যাইতে পারে ; কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া গরিলা যুদ্ধ কখনই চালানো যায় না। তবে গোড়া হইতে যদি গভর্ণমেণ্ট স্বপক্ষে থাকে তাহা হইলে জনগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া গরিলাদল সংগঠনের কাজ সহজ হইয়া আসে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা হইল না; চীনেও তাহা প্রথমে হয় নাই। বর্তমানে দূর হইতে লক্ষ্য করিলে চীনের বিস্তৃত বিশাল প্রান্তরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চীনা সৈন্যদলের মাঝে যেন বেশ-একটা যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দক্ষিণ ও মধ্যচীনে গভর্ণ-মেণ্টের স্থায়ী-সৈন্যদল আগল দিতেছে এবং তাহাদের সাহায্যে ও প্রেরণায় দক্ষিণ-পূর্ব চীনে ছোট ছোট গরিলাদল জাপানীদের বিব্রত করিতেছে। উত্তর চীনে পশ্চিম পার্শ্বে লালফৌজ বা অষ্টম রুট আর্মি তাহার ঘাঁটি বাঁধিয়াছে এবং তাহাদের আশ্রয়ে ও উৎসাহে বিশাল ও বিক্ষিপ্ত গরিলাদল উত্তর চীনের রেল-লাইনকে ঘিরিয়া জাপানীর অগ্রগতিকে রোধ করিয়াছে। কিন্তু

এই শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে যখন জাপানীরা প্রথম চীন আক্রমণ করিল তখন চিয়াং কাইশেকের অধীনস্থ স্থায়ী-সৈন্যদল বিভ্রান্ত ও অসংলগ্ন; আমাদেব দেশের দেশীয় রাজ্যের মতো চীনের অভ্যন্তরে যেসব ছোট ছোট রাজ্য ছিল, সেখানকার বিভিন্ন সামন্তেরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ও অসঙ্ঘবদ্ধ; অষ্টম রুট আর্মিও নানাভাবে মধ্যচীনে বিব্রত হইয়া বহু রাস্তা ঘুরিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আশ্রয় লইয়াছে। এই সুযোগে হু-হু করিয়া জাপানীদের একটি বাহিনী পিপিং হইতে দক্ষিণে বরাবর রেল-লাইন বাহিয়া অগ্রসর হইল এবং আরেকটি বাহিনী সাংহাই হইতে রেল-লাইন ও ইয়াংসি নদী বরাবর পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া মধ্যচীনে প্রথম বাহিনীর সহিত মিলিত হইল; এবং তৃতীয় বাহিনী ক্যান্টন হইতে উত্তরগামী হইয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল। ইহার ফলে অতি শীঘ্র চীনের উত্তর-পূর্বাংশে অনেক-গুলি প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে কতকগুলি প্রদেশ প্রথম হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময় চীনের মূল শক্তি—অর্থাৎ লালফৌজ ও চিয়াং কাইশেকের অধীনস্থ সৈন্যদলগুলি মোটামুটিভাবে জাপানীদের বেষ্টিত বা অধিকৃত এই সকল অঞ্চলের পশ্চিমে পড়িয়া যায়। চীনের এই পশ্চিমাংশে ধীরে ধীরে সাম্যবাদীদের তৎপরতায় জাতীয় শক্তি সংহত হইল। মার্শাল চিয়াং-এর অধীনে সকলে একত্রিত হইয়া জাপানীর

বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। লালফৌজ অবশ্য প্রথম হইতেই পশ্চিম হইতে গরিলা-নীতিতে জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিতে শুরু করে। সে যাহা হউক, পশ্চিমাঞ্চলে চীনের গোটা শক্তিকে সংহত করিতে বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। সেই সময় উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং গভর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে ছোট ছোট অসংখ্য গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করিয়া জাপানীদের ক্ষত-বিক্ষত করিতে শুরু করে। মার্শাল চিয়াং কাইশেকের গভর্ণমেণ্ট এই অঞ্চলের গরিলা-বাহিনীদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, গরিলা যুদ্ধের মূল্য অনুধাবন করিতেই তাঁহার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল।

"At the November (1938) military conference held in Kwangsi the military commands were reshuffled and the Generalissimo explained that the new slogan meant organisation of farm unions, mass education and mobilisation of guerrilla armies in the Yangtze valley similar to those operating in north provinces under the command of Eighth Route Army......Only in December 14 this second stage of war tactics was recognised in peoples political Congress in Chunking."—China at War—by F. Utley.

অন্য দিকে লালফৌজ চীনের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব ও দক্ষিণগামী হইয়া সান্‌সি চাহার ও হোপে প্রদেশের সীমান্তে গরিলা-নীতিতে জাপ সৈন্যদের বিব্রত করিতে থাকিলে, চীনের উত্তর-পূর্ব খণ্ডে হোপে, সাংটাং, কিয়াংসি প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন প্রদেশে যে-সকল ছোট ছোট গরিলাবাহিনী স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া

উঠিয়াছিল, তাহার সহিত যোগাযোগ করিতেও লালফৌজের বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। পিপিং সহরের সন্নিকটে চাওতুঙের নেতৃত্বে যে দুর্ধর্ষ গরিলাদল জন্ম নিয়াছিল তাহার সহিত লালফৌজের সংযোগ স্থাপন করিতে ১৯৩৭ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত সময় লাগিয়া গিয়াছিল।

At the end of November (1937) a messenger came to Chao Tung's headquarters in the mountains near Nankow. He brought a letter from Chu Teh Commander of the former Red Army, now the Eighth Route Army of the National Government. They wrote that they had heard of Chao Tung's detachment and that they hoped it would consent to co-ordinate its activities with those of the regular forces and partisan units of the Eighth Route Army in the interests of more effective struggle against the enemy."

—Peoples war—by Epstein.

জাপ-আক্রমণের প্রাক্কালে চীনের দুইটি শক্তিকেন্দ্র ছিল, লালফৌজ এবং চিয়াং কাইশেকের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। অতএব আমরা দেখিতেছি, অধিকৃত অঞ্চলে যে-গরিলাদল একে একে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারা প্রথমে এই দুইটি শক্তিকেন্দ্রের অথবা কোনো ষ্টেট বা সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে নাই। ক্ষুদ্র হোপে প্রদেশের বিভিন্ন গরিলা দলগুলির কথা জানা থাকিলে, তথ্য আরও সহজ হইবে।

(ক) পিপিং সহরের সংলগ্ন গ্রামগুলিতে চাওতুঙের নেতৃত্বে যে-গরিলাবাহিনী দেখা দেয় তাহার পশ্চাতে

এক রোমাঞ্চর ইতিহাস রহিয়াছে। জাপানী আক্রমণের দুই-একদিন পরে চাওতুঙের মাতা মাদাম চাও এক ধনীর গৃহ হইতে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিয়া সহর হইতে কোনো মতে আটটি মজার ও দুইটি ব্রাউনিং বন্দুক ক্রয় করিয়া পুত্রের হাতে দিলেন। চাওতুঙ ও তাঁহার পাঁচজন সহকর্মী একদিকে এই স্বল্প অস্ত্র সাহায্যে জাপানীর হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য গ্রামে-গ্রামে কর্মীদের সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহা ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে যে, এই ১০টি বন্দুক ও ছয়টি প্রাণী বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে দেড়-হাজার যোদ্ধাকে মারণ-অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া মরিয়া হইয়া লড়িবার জন্য সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। (খ) এই প্রদেশের মধ্যাঞ্চলে লু-চেঙ সাও-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দল গড়িয়া উঠে। তাহারা এই দলের নাম রাখিয়াছিল Hopei People's self-Defence Army. অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য, রেলের কুলি ও কর্মী এবং কৃষকেরা এই দলকে পুষ্ট করে। (গ) তৃতীয় দল টেমিং সহরকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ইহাদের দলে এক হাজার যোদ্ধা একত্রিত হয়। এই দলের সহিত যোগ দিয়া ২০০ ছাত্র কর্মী গ্রামে-গ্রামে প্রচারকার্যে সাহায্য করিয়াছিল। (ঘ) হোপে হোনান প্রদেশের সীমান্তে জেহিসিনে চতুর্থ দল দেখা দেয়। ইহারা সংখ্যায় প্রায় চার হাজার ছিল। (ঙ) হোপে

হোনান ও শান্‌সি প্রদেশ যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেই স্থানে তৈহাং পার্বত্যাঞ্চলে আবেকটি দুর্ধর্ষ গবিলাদল গড়িয়া উঠে। তিয়েনসিং ইঞ্জিনিয়ার কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ইয়াং সিউ-লিঙ এই দলের নেতা ছিলেন। (চ) ইতিমধ্যে পিপিং এবং তিয়েনসিং সহরে North China National Salvation Association নামে যে-সমিতি ছিল তাহা জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবাব জন্য নূতনভাবে সংগঠিত হইল। এই নব গঠিত দল North China People's anti-Japanse Self-defence Committee এই নূতন নাম গ্রহণ করিল। ১৯৩৯ সালে হোপে প্রদেশেব এই দলগুলিতে মোট যোদ্ধাসংখ্যা ২০,০০০ বিশ হাজাবে পৌছিয়াছিল। বর্তমানে লালফৌজের নেতৃত্বে এই বিছিন্ন দলগুলি একত্রে সংযোজিত হইয়া জাপানী সৈন্যদলে এক ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি কবিলেও ইহারা আপন প্রেবণায় জন্ম-গ্রহণ কবিয়া বহুদিন অবধি কোনো সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল। ষ্টেটের সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া জনসাধারণ বাঁচিবার একান্ত তাগিদে, আপন উদ্যমে ও আপন পন্থায় শত্রুকে রুখিবার জন্য গ্রামে-গ্রামে গরিলাদল সৃষ্টি করিতে পারে—চীনের ইতিহাস যদি কোনো শিক্ষা আমাদের দিয়া থাকে তবে ইহাই। ভারতের জনসাধারণ আজ মনে প্রাণে অনুধাবন করিতেছে যে, জাপানী গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পরম শত্রু ; ভারত গভর্ণমেণ্টও জাপানী আক্রমণকে রুখিবার জন্য

বদ্ধপরিকর ;—এমন অবস্থায়ও যদি আমরা জনসাধারণের মধ্যে গরিলা যুদ্ধের আহ্বানে উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে না পারি, তবে কিসের আশায় আমাদের নেতারা এতদিন স্বাধীনতার উদাত্ত মন্ত্র আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন ?

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্থায়ী-সৈন্যদল ও গরিলাদের মধ্যে একান্ত যোগাগোগ আবশ্যক। এখানে যেন আমরা একটা কথা ভুলিয়া না যাই যে, গরিলাদলদের যেমন স্থায়ী-সৈন্যদলের সাহায্য আবশ্যক, তেমনি স্থায়ী-সৈন্যদলকেও অনেক বিষয়ে গরিলাদলের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। গরিলাদলে খাদ্য ও আশ্রয়ের সমস্যা নাই ; কারণ, তাহার ভিত্তিও জনগণ। জনগণই আপন স্বার্থে ও আপন প্রেরণায় তাহাদের মুখের গ্রাস গ্রহণ না করিয়া গরিলাদের খাওয়াইবে এবং আপন জীবন ও গৃহকে বিপন্ন করিয়াও তাহাদের আশ্রয় দিবে। গরিলা-যোদ্ধাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ভোগ ভুগিতে হয় অস্ত্রের সন্ধানে। স্থায়ী-সৈন্যদলের নিকট তাহাদের যদি কোনো সাহায্য আশা করিবার থাকে তবে তাহা অস্ত্রের। কিন্তু যেহেতু গরিলা যোদ্ধাদের অধিকাংশ অবস্থাতেই শত্রুব্যূহের পশ্চাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়, সেজন্য অস্ত্রের সাহায্য পাইবারও আশা প্রায় দুরাশা হইয়া পড়ে। যুদ্ধ-লাইনের এপার হইতে যোগাযোগ রাখিয়া শত্রুর ব্যূহ ভেদ করিয়া গরিলাদের হাতে অস্ত্র

পৌঁছাইয়া দেওয়া শুধু সমস্যা নহে, প্রায় অসম্ভবই। ইহা ছাড়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইলে গরিলা-সৈন্যদের পক্ষে শত্রুদের অস্ত্র ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না। লড়াই বাধিবার প্রথমে যদিই-বা কিছু অস্ত্র ও রসদ ইহাদের হাতে দেওয়া যায়, দুইদিন পরে দেখা যাইবে, স্বপক্ষের বন্দুক গুলীর অভাবে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় শত্রুর হাতের বন্দুক কাড়িয়া তাহা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না; কারণ—শত্রুর বন্দুকের উপযুক্ত ও মাপমতো গুলী শত্রুর নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার অবকাশ মেলে, কিন্তু যুদ্ধ লাইনের ওপার হইতে স্বপক্ষের বন্দুকের মাপমতো গুলী জুটানো দায়। সর্বস্থানেই দেখা গিয়াছে, যুদ্ধরত জাতিগুলি এমনভাবে অস্ত্র নির্মাণ করে যে, একপক্ষের বন্দুকে অন্যপক্ষের গুলী কাজে লাগানো যায় না। রাশিয়ার গরিলা-যোদ্ধারা কীভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতে মিলিবে,—

"Our men try to provide themselves with German automatics as often as possible. It is easier to obtain ammunition for them as our own cartidges are running out. All that is needed for the others is to make quick raid on a German column."

(With a Soviet Unit through the Nazi lines, by a Polyakov

তবে একটা বিষয়ের জন্য গরিলা-যোদ্ধাদের স্থায়ী-সৈন্য-দলের সহিত যোগাযোগ একান্তভাবে আবশ্যক। বিস্তৃত দেশে সর্বস্থানে সমভাবে গরিলা যুদ্ধ চালানো যায় না।

তাহার বিশেষ কতকগুলি স্থান বাছিয়া লইতে হইবে। শত্রুর যাতায়াত-ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াএবং শত্রুর বিক্ষিপ্ত দলকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া গরিলাদল একদিকে যেমন স্বপক্ষের স্থায়ী-সৈন্যদলের পথ সুগম করিতে পারে, তেমনি অগ্রগামী শত্রুর পথ দুর্গম করিতেও পারে। এইজন্য গরিলাদলের জানা আবশ্যক—রণ-পরিকল্পনানুযায়ী কোথায় আমাদের প্রধান স্থায়ী-সৈন্যদল অগ্রসর হইতে চায়; অথবা তাহাদের বিস্তৃত মহড়ায় কোথাও এমন দুর্বল স্থান রহিয়া গিয়াছে কি না, যেখানে শত্রুদল সহজেই লাইন ভাঙিয়া ফেলিতে পারে; অথবা এমন কোনো স্থান রহিয়া গিয়াছে কি না, যেখানে গরিলাদল আধিপত্য করিতে পারিলে সহজেই তাহারা পশ্চাতেব স্থানীয়-সৈন্যদলের সহিত যোগাযোগ রাখিতে পারে। এক কথায় গোটা সৈন্যদলের পরিবেশন এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা চাই; এবং ইহা জানা থাকিলে গরিলাদল সম্ভবমতো স্থায়ী-সৈন্যদলকে সাহায্য করিতে পারে।

এই শেষোক্ত বিষয়ে গরিলাদলের যতখানি, স্থায়ী-সৈন্য-দলের পক্ষেও আপন কার্যসিদ্ধির জন্য ঠিক ততখানি যোগা-যোগ রাখা আবশ্যক। আজ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তির সঙ্গে একত্রে দাঁড়াইলেন না, বা চেষ্টা করিয়াও দাঁড়াইতে পারিলেন না। রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো-কিছু করি-বার সময় ভবিষ্যতের ফলাফল লইয়া বহু মাথা ঘামাইতে হয়

বা ঘামাইবার অবসর মেলে। কিন্তু রণক্ষেত্রের নীতি অন্যরূপ। শত্রুর কামান হইতে নির্গত প্রোজ্জ্বলিত গোলা তোমাকে ভাবিবার অবকাশ দিবে না। সেখানে একমাত্র নীতি—বিদ্যুৎ-গতিতে আগত বিষাক্ত গোলাকে অবিলম্বে এবং যে কোনো ভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে। সেইজন্য রাজনীতি-বিজ্ঞেরা আজ হয়ত আমাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিলেন না; কিন্তু শত্রু যখন ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিবে তখন সামরিক কর্তৃপক্ষেরা যদি জানেন যে-আমরা আমাদের স্বল্প অস্ত্র লইয়া তাহাদেরই পরম শত্রুকে ক্ষত-বিক্ষত করিবার জন্য আমরণ ব্রত লইয়া উদ্যত হইয়াছি, তবে তাঁহারাই স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিতে ব্যস্ত হইবেন। যে-গোলা বৃটিশ বা মার্কিণ সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে গোলাকে যদি কোনো ভারতবাসী স্বেচ্ছায় বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে চায়—ইতিহাসের পাতায় এমন কোনো নির্বোধ সেনাপতি মিলে নাই, যে তাহাকে বাধা দিতে চাহিবে। রণক্ষেত্র হইতে সুদূরে দেশের অভ্যন্তরে বসিয়া জাতির ভাগ্য লইয়া ক্রীড়া খেলা চলিতে পারে; কিন্তু রণক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সমস্যাকে জটিল করিবার নেশা ঘুচিয়া যায়।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম, দ্বিতীয় প্রশ্ন লইয়া আজিও যদি কোনো সমস্যা থাকে, তবে দুইদিন পরে সে সমস্যা থাকিবে না। গরিলাদল ও স্থায়ী-সৈন্যদলে পরস্পরের

যোগাযোগ থাকা আবশ্যক এবং পরস্পরেই আপন তাগিদে যতদূর সম্ভব মিলিত হইবেই।

বিদেশীর সাহায্যে গরিলা যুদ্ধ

এই প্রসঙ্গে, আরেকটি প্রশ্ন আলোচনা করা আবশ্যক। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্থায়ী-সৈন্য অথবা বিদেশী সৈন্য দিয়া গরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব কিনা ? ব্রহ্মের যুদ্ধের সময় আমরা জানিয়াছিলাম, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রাশিয়া ও চীনের কাহিনী হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া গরিলা যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মের প্রান্তরে চীনা-গরিলাদের আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চীনের স্থায়ী-সৈন্যদলের সহিত তাহাদের বহু গরিলাদল পিঠে এক বস্তা হাত-বোমা এবং হাতে একখানি ছোট তলোয়ার লইয়া মিত্রপক্ষকে সাহায্য করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ব্রহ্ম-দেশের পথে ঘাটে ও নিবিড় জঙ্গলে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এদিকে আবার আমরা শুনিতেছি, সিংহলে স্থায়ী-সৈন্যদলকে গরিলা-কৌশল শিক্ষা দেওয়াও হইতেছে। ইহাতে মনে হয়, ইহা যেন আসল ফেলিয়া নকলকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা।

পূর্বের আলোচনায় ইহা নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে, একমাত্র মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ জাগ্রত জনগণই কার্যকরী গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করিতে পারে। ড্রিল বা লেফট-রাইটের মারফতে ইহার

সৃষ্টি সম্ভব নয়। জনগণের ভিতর হইতে ইহারা সুধু জন্মলাভ করিবে না; মৃত্যুর সম্মুখে ইহাদের ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ করিয়া আরও পুষ্ট করিবার দায়িত্ব এবং শত্রুর উদ্যত মারণ-অস্ত্র হইতে ইহাদের রক্ষা করিবার ও আশ্রয় দিবার দায়িত্বও জনগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। গরিলাদল যদি মুহূর্তের মাঝে জনগণের আশ্রয়ে তাহাদের সহিত মিশিয়া না যাইতে পারে তবে শত্রুর যান্ত্রিক অস্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদের নিঃশেষ করিয়া দিবে। দশের ভিতর হইতে গরিলাদের যদি অতি সহজেই খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তবে তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের জন্য টিঁকিয়া থাকা দায়। দেশের অধিবাসীর সহিত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে, মেলামেশায়—একান্তরূপে এক হইয়া শত্রুর সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে হইবে। সুধু তাহাই নয়, ইহাদের যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আহ্বানে আপন দেশের অধিবাসীদিগের জড়তা ভাঙিয়া তাহাদিগকে মারমুখো করিয়া তুলিবার অন্যতম দায়িত্ব লইতে হইবে। যুদ্ধ যতই চলিতে থাকিবে, ততই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই ক্ষয়-ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিবার মনোভাব জাগাইয়া তোলা কোনো বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে সম্ভব নহে।

ইহা ছাড়া কোনো গরিলাবাহিনীর পক্ষে অন্যদেশে আসিয়া যুদ্ধ চালাইবার একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। গরিলাযুদ্ধ

চালাইতে হইলে স্থানীয় পথ-ঘাট, নদী-নালা, গ্রাম-সহর, পাহাড়-প্রান্তর সমস্ত কিছুই যোদ্ধাদের নখদর্পণে থাকা চাই। এই ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকিলে ঝট করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া শত্রুকে বিহ্বল করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আবার তড়িৎ-বেগে পলাইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। ধরুন, আজ যদি জাপানের সমবেত সৈন্যদল ঢাকা হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হয়, তবে গরিলাদলগুলিকে জানিতে হইবে, এই পথে জাপানী শিবিরকে কোথায় কোথায় আঘাত দিয়া আবার নিশ্চিন্তে পলাইয়া যাওয়া সম্ভব; এই পথে কোথায় বিল আছে, শীতের সময় পদ্মার কোথায় কোন্ চরে জাপানী সৈন্যদলের বজরাগুলি আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে; কোন্ কোন্ পথ দিয়া সাইকেল সাহায্যে গরিলা-যোদ্ধারা নিশ্চিন্তে অগ্রসর হইতে পারে; নদীর আঁকেবাঁকে কোথায় কোথায় কোন্ হাট বা বসতি আছে যেখান হইতে গরিলা-যোদ্ধারা নৌকা বা ডিঙি সাহায্যে নদী পার হইতে পারে; কোথায় কোথায় কোন্ গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থ আছে যেখানে তাহাদের আশ্রয় ও আহার মিলিতে পারে। এই রকম বহু খুঁটিনাটি খবর প্রত্যেক গরিলা-যোদ্ধার পক্ষে একান্ত জানা আবশ্যক। ইহার জন্যই কোনো বিদেশী যোদ্ধার পক্ষে এখানে আসিয়া কার্যকরীভাবে গরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণের অভ্যন্তর হইতে এই যোদ্ধাদের আহ্বান করিতে হইবে। গরিলা

যোদ্ধাদের একদিকে যেমন জনগণের সহিত একান্তভাবে জড়িত থাকা আবশ্যক, তেমনি অন্যদিকে দেশমাতৃকার সহিত একান্তভাবে পরিচিত থাকা আবশ্যক।

ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধের প্রযোজ্যতা স্বীকার যখন করাই হইতেছে, তখন তাহা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য মিত্রপক্ষ আরেক ধাপ নির্ভয়ে অগ্রসর হউন, মুক্তির সন্ধানে নাৎসীর বিরুদ্ধে আহ্বান করিয়া জনগণের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিন। ইহাই ব্রহ্ম ও ভারতবাসীর দাবী।

(২)

গৃহরক্ষীদল ও গরিলাদল

"The position in south India demands courage and I feel a yearning to take the risk. I, therefore, justify my demand that we should be permitted to form Government in south India. Now it has become a question of self-defence. I, therefore, feel we have a duty to perform and that is why I feel that this is necessary."

—Rajaji. 5. 5. 42.

ইতিহাস তাহার পথ বাছিয়া লইতেছে। একদিকে অসংখ্য জনগণ শত্রুর গোলা-গুলীতে ও অগ্নিবর্ষণে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া গৃহ, সংসার, সম্পদ ও জীবনকে হারাইতে বসিয়াছে; আর অন্যদিকে দেশ-নেতারা মান-অভিমানের অন্তরালে বীর্যহীনের মতো দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টায় কথার জাল সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত। মালয়ের যুদ্ধ ইহাদের শিক্ষা দেয় নাই, ব্রহ্মের যুদ্ধ ইহাদের বিচলিত করে নাই, সিংহল ও মাদ্রাজের বোমাবর্ষণও ইহাদের অস্থির করিয়া তুলিল না। ইহাদের চিন্তার জড়তা ভাঙিতে হয়ত মাদ্রাজ বাঙলা ও আসামের বলিদান আবশ্যক! কিন্তু বাঙলা আসাম ও মাদ্রাজের অধিবাসী আমরা রণাঙ্গনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদের ভাগ্য লইয়া এই ক্রীড়া-খেলা করিতে দিতে প্রস্তুত নহি। তাই প্রবীণ জননায়ক

রাজাজীর কণ্ঠ হইতে তেজোদ্দীপ্ত বাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, দায়িত্ব না হয় লইলাম, কিন্তু আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় আমরা নূতন কী করিতে পারিব? উত্তরে রাজাজী বলিয়াছেন—

"I think that if a local national front could be created for this purpose we can defend the country much more effectively than many of my colleagues think to be. I should, for instance, be able to organise a Home-Guard and get all the villages to exercise and drill and be ready to receive and use equipment as soon as it is made available. I think the psychology of the people would be vastly altered. All people could be put under work which is not the case at present."
—4. 5. 42.

অর্থাৎ সর্বদল সম্মিলিত হইয়া যদি আমরা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তবে আর কিছু না পারিলেও, গ্রামে গ্রামে গৃহরক্ষীদল গড়িয়া তুলিয়া এবং গ্রামে গ্রামে আত্মরক্ষার জন্য কুচকাওয়াজ ও মহড়া করিয়া দেশবাসীকে এমনভাবে প্রস্তুত ও শিক্ষিত করিয়া রাখিতে পারি যে, তাহারা অস্ত্রের সন্ধান পাইবামাত্র একযোগে লড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে।

বাঙলা দেশেও প্রধান মন্ত্রী আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় দেশবাসীর কার্যকরী সহযোগিতা পাইবার আশা লইয়া গৃহরক্ষীদল গঠনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। এই গৃহরক্ষীদলের যে পরিকল্পনা বাহির হইয়াছে তাহা, আশানুরূপ না হইলেও, সৈন্য

ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রাখিবার যে-ইচ্ছা অথবা দেশবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণের সুযোগ দিয়া যে-আত্মবিশ্বাস জাগরূক করিবার উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। বীর ও সংগ্রামকামী বাঙালী এই সুযোগকে অবহেলা করিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

* * *

আমরা বহুদিন ধরিয়া জাপানীকে রুখিবার জন্য বাঙলা দেশে গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করিবার কথা বলিয়া আসিতেছি। মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা বারবার স্বীকারও করা হইয়াছে। তাঁহারা ব্রহ্মে এবং সম্প্রতি সিংহলে গরিলা-যুদ্ধের শিক্ষা দিতেছেন সত্য, কিন্তু ইহার মূল ভিত্তিকে আজিও সাহসের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্থায়ী সৈন্যদলকে হাল্কা অস্ত্র ও স্বল্প পোষাক দিয়া ছোট ছোট দলে শত্রুকে নিধন করিবার পরিকল্পনা দিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্বে বহুভাবে দেখাইয়াছি যে, গরিলাদলের ভিত্তিভূমি জনগণ। কর্তৃপক্ষ সেই জনগণকে তফাৎ রাখিয়া গরিলা যুদ্ধের সুবিধাটুকু গ্রহণ করিতে ব্যস্ত। সাহসভরে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ দিব না এবং তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিব না ; অথচ দেখিতে চাই যে, জাপানীরা ভারতের প্রতি পথে আসিয়া নিদারুণ ভাবে বিপদগ্রস্ত হইবার ভয়ে ভীত হউক—ইহা হয় না।

গৃহরক্ষীদল ও গরিলাদল

সম্প্রতি গৃহরক্ষীদল গঠনের অবকাশ পাওয়াতে অনেকে মনে করিতেছেন, ইহারাই বুঝি গরিলাদল। কিন্তু গৃহরক্ষীদল ও গরিলাদলে অনেক তফাৎ। তবে, তফাৎ থাকিলেও যখন অন্য পথ মিলিতেছে না, তখন আমাদের এই দলকেই পুষ্ট করিয়া কার্যকালে ইহাদের গরিলাদলে পরিণত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, আর কিছু না হউক, দল গঠনের সুযোগ মিলিয়াছে এবং অস্ত্রও কিছু মিলিবে। এই দলগঠনের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আজ যাহাদের হাতে ন্যস্ত হইবে তাহারা যদি অপটু হন তাহাতে আশঙ্কা করিবার কিছু নাই; কারণ, এই দলকে একদিন-না-একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া বুঝিতে হইবে এবং সেই মৃত্যুর সম্মুখে অপটু ও অকর্মণ্য নেতাদিগকে প্রকৃত ভয়-শঙ্কাহীন মৃত্যুঞ্জয়ী জননেতার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেইজন্যই আজ আমাদের এই রক্ষীদল গঠনে সাহায্য করাই প্রধান কর্তব্য।

গরিলাদল ও রক্ষীদলে প্রভেদ

আমাদের প্রধান মন্ত্রী যখন গৃহরক্ষীদল গঠনের বর্ণনা করিয়াছিলেন তখন তিনি জানান যে, ইহা অন্যান্য দেশের অনুকরণে গঠিত হইবে ;—'more or less on the lines of Home-Guards in other countries.' এই অন্যদেশ বলিতে বৃটেনই বুঝিতে হইবে; কারণ, সেই দেশেই প্রথম ও

সুষ্ঠুভাবে ইহা গড়িবার চেষ্টা চলিয়াছে। এইবারের বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লইয়া যখন বৃটিশ শক্তি গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল, কী করিয়া জার্মাণদের attack in depth—'গভীর আক্রমণ' পন্থাকে বিফল করা যায়। জার্মাণীর এই অভিনব আক্রমণ পন্থা আমরা পূর্বে বহুবার বিশ্লেষণ করিয়াছি। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যখন যন্ত্রের সুযোগে অগণিত সেনাকে অগণিত অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দেশের এক সীমানা হইতে অন্য সীমানা পর্যন্ত দুর্ভেদ্য মহড়া বা ফ্রণ্ট লাইন করা সম্ভব হইল, তখন আর পূর্বের মতো সৈন্যদলকে পার্শ্ব হইতে বেড় দিয়া ঘেরাও করিয়া পিষিয়া মারার সুযোগ রহিল না। অতএব জার্মাণ সেনাপতিরা দেখিলেন, কেবলমাত্র সম্মুখ-রণে দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য সৈন্যের প্রাচীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। এই সৈন্যদলকে তাজা ও সক্ষম রাখিবার জন্য যে-জনগণ পশ্চাৎ হইতে আহার, রসদ ও অস্ত্রের জোগান দিতেছে, সেই জনগণকে এবং এই জোগান দিবার ব্যবস্থাকে দুর্ধর্ষ আঘাতে বিশৃঙ্খল করিয়া দিতে হইবে; এবং ইহা সম্ভব হইলে সম্মুখে দণ্ডায়মান সৈন্যদল আপনা হইতে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবে। ইহা করিবার তিনটি পথ বাহির হইল :—

(ক) ছোট ছোট সৈন্যদল উপযুক্ত অস্ত্র লইয়া সামান্য একটু পথ পাইলেই সেই ছিদ্র দিয়া পরস্পরের সহিত

যোগাযোগ না রাখিয়াই দেশের সুদূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাইবে। হয়ত তাহাদের কোনো কোনো দল বিপক্ষের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হইবে। কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাই পশ্চাতের ঘাঁটি, রেল-লাইন, টেলিগ্রাফ বা যাতায়াতের ব্যবস্থাকে ছিন্ন করিয়া বিশৃঙ্খলা আনিতে পারিবে।

(খ) আকাশপথে দেশের মধ্যে প্যারাসুট-সৈন্য অবতরণ করাইয়া জনগণকে অধিকতর ভাবে বিমূঢ় করিয়া দিতে হইবে।

(গ) প্রচার সাহায্যে দেশের মধ্যে পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করিয়া এই বিশৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলতর করিয়া তুলিতে হইবে।

অর্থাৎ, একটা গোটা দেশের সকল গ্রাম সহর পথ ঘাট সমস্তই রণাঙ্গণে পরিণত হইল। কিন্তু সর্বস্থানে শত্রুকে আগল দিবার সৈন্য কোথায়? যদি স্থায়ী-সৈন্যদলকে দেশের অভ্যন্তরের পথে-ঘাটে ছড়াইয়া থাকিতে হয়, তবে সম্মুখে আবার মহড়া দুর্বল হইয়া পড়ে।

"The problem is : if every single square mile of territory is to be organised as if it were in the front line, it will be necessary for practically the whole male population to be called up for the regular army. But this would so disrupt civilian life as to make it impossible to supply that army. Thus the problem can only be solved by the establishment of an army of producers who are also trained and ready as combatant soldiers. This is precisely the idea of Home-Guard."

—Home-Guard for Victory, by Slater.

ফলে, দেশের প্রতি-বর্গমাইলে যদি সৈন্য রাখিতে হয়, তবে দেশের প্রতি-পুরুষকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে হইবে ; কিন্তু ইহাতে আবার দেশের পণ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন অচল হইয়া পড়িবে। ইহারই জন্য গৃহরক্ষীদলের সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ দেশের জনগণের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হইবে কিন্তু তাহারা স্থায়ী-সৈন্যদলে যোগ দিবে না ; যে যেখানে, যে-কারখানা বা ক্ষেতে কাজ করে তাহা করিতে থাকিবে ; কিন্তু কোনো শত্রুদল সেখানে আসিলে দ্রুত দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আগল দিতে যাইবে এবং সেই মুহূর্তে স্থায়ী-সৈন্যদলকে সাহায্যের জন্য খবর দিবে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য বৃটেনের গ্রামে-গ্রামে কিছুদূর অন্তর অন্তর সুবিধা মতো স্থানে—অর্থাৎ রাস্তা নদী বা রেল-লাইনের সঙ্গমস্থলে পরিখা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া এক-একটা ঘাঁটি করা হইয়াছে এবং শত্রু আসিলে সেই ঘাঁটিকে কেন্দ্র করিয়া যতক্ষণ-না স্থায়ী-সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা চলিবে।

বৃটেনের এই ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি জিনিষ লক্ষ্যে আসে :

(১) রক্ষীদলকে শত্রুর আক্রমণ রুখিবার জন্য পরিখা প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইবে।

(২) শত্রুকে সম্মুখ-রণে অন্তত কিছুক্ষণ লড়িবার মতো

অস্ত্র রক্ষীদলের হাতে থাকা চাই এবং তাহা চালনার শিক্ষা থাকা চাই।

(৩) স্থায়ী-সৈন্যদলের সাহায্য দ্রুত পৌঁছিবার ব্যবস্থা থাকা চাই এবং তাহাদের সহিত দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও আবশ্যক।

(১) বৃটেনের এই পরিকল্পনার ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইবে, রক্ষীদলেব ঘাঁটির আশ্রয় চাই এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহারা সম্মুখ-রণে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইবে; কিন্তু কোনো গ্রামের ঘাঁটিগুলি শত্রুর দ্বারা যদি অধিকৃত হয়, তবে আর-যেন সেখানে শত্রুকে বাধা দিবার কিছু থাকিবে না। অর্থাৎ, তাহাদের শত্রুকে বাধা দিবার পন্থা স্থায়ী-সৈন্যদলের মতোই হইবে। একবার স্থান বে-দখল হইলে সে স্থানে শত্রু নিরাপদ। কিন্তু গরিলাবাহিনীর গোটা উদ্দেশ্যই অন্যরূপ। স্থান দখল হইলেই শত্রুর দুশ্চিন্তা অধিকতর হইবে; অসতর্ক মুহূর্তে দুর্বল স্থানে ক্ষত-বিক্ষত হইবার আশঙ্কায় শত্রুদল সন্ত্রস্ত থাকিবে। গরিলাদলের যদি কোনো ঘাঁটি বলিতে কিছু থাকে, তবে তাহা জনগণ। জনগণের আশ্রয়ে গরিলারা বাঁচিয়া থাকিবে এবং অসতর্ক মুহূর্তে শত্রুকে এবং শত্রুর আহার ও রসদ ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করিবে।

বৃটেন ছোট দেশ; কাজেই স্বল্প স্থানে ঘাঁটির জাল সৃষ্টি করিয়া শত্রুকে সম্মুখ-রণে বাধা দিবার কথাই তাহারা প্রধানত

চিন্তা করিতেছে। ছোট দেশ বলিয়া শত্রুরা জালে মৎস্য শিকারের মতো সমস্ত সৈন্যকে ছাঁকা করিয়া নির্মূল করিতে পারিবে। কাজেই শত্রুরা সে-দেশে আসিয়া দেশ দখল করিবার পর গরিলা-নীতিতে শত্রুকে ক্ষতবিক্ষত করিবার অবকাশ কম মিলিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ ; ইহার অরণ্য, ইহার পর্বত, ইহার প্রান্তর বিস্তৃত ; শত্রুর পক্ষে যেমন ইহার সর্বস্থানে সমান শক্তিতে দখল রাখা সম্ভব হইবে না, তেমনি আমাদের গরিলাবাহিনীগুলি নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিয়া—আজ এখানে কাল সেখানে—শত্রুর দীর্ঘ যোগাযোগ-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা আনিয়া ক্ষয়রোগের মতো তাহাকে নিঃশেষ করিতে সক্ষম হইবে। সেই জন্য রণ-নীতির দিক হইতে আমাদের উচিত হইবে, সম্মুখ-রণে আগল দিতে গিয়া নিজের ক্ষতি বেশি না করিয়া, বিস্তৃত ও দুর্গম স্থানের সুযোগ লইয়া গরিলা-নীতিতে শত্রুকে দুর্বল ও নিঃশেষ করা।

(২) বৃটেনের রক্ষীদলকে প্রায় স্থায়ী-সৈন্যদলের কার্য করিতে হইবে। যেহেতু স্থায়ী-সৈন্যদল সর্বস্থানে সমভাবে আগল দিতে পারিতেছে না, সেজন্য রক্ষীদল সৃষ্টি করিয়া একই পন্থায় শত্রুর প্রথম ধাক্কা সামলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম ধাক্কা সামলাইতে অক্ষম হইলে বা অক্ষম হইবার আশঙ্কা থাকিলে তৎক্ষণাৎ স্থায়ী-সৈন্যদলের সাহায্য পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইতেছে। শত্রুকে এইভাবে মুখোমুখি হইয়া রুখিতে

গেলে উপযুক্ত অস্ত্র চাই। বৃটেনের রক্ষীদলকে সে-অস্ত্র দেওয়ার চেষ্টা চলিয়াছে। এমন কি, গ্রাম্য রক্ষীদলের হাতেও মর্টার, বড় হাত-বোমা, মেসিনগান, ডিনামাইট দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু, ভারতে আজ ইহা সম্ভব নয় বলিয়াই জানি। এই অস্ত্রের ঘাটতি আছে বলিয়াই বিলাতের অনুকরণে ভারতে রক্ষীদল গড়িতে যাওয়ার বিশেষ কোনো অর্থ হয় না। আমাদের অস্ত্র জোগাড় করিতে হইবে শত্রুর নিকট হইতে। শত্রুর অস্ত্রে শত্রুকে নিধন করিব, ইহাই গরিলাদলের নীতি। ইহা ভিন্ন সম্মুখ-রণে বাধা দিতে গেলে অস্ত্র-চালনার ও যুদ্ধবিদ্যার প্রচুর শিক্ষা আবশ্যক। ভারতে হয়ত আজ আর সে অবসর নাই ; শত্রু গৃহদ্বারে হামলাইতেছে। গরিলা যুদ্ধের নীতি ও কৌশল এমনি যে, প্রথমে ইহার শিক্ষা অতি অল্পই লাগে। শিক্ষা অপেক্ষা দীক্ষাই এখানে বড় কথা। এই মরণজয়ী দীক্ষা থাকিলে ধীরে ধীরে গরিলা যুদ্ধের শিক্ষা আপনিই মিলিবে। আজ এক গ্রামে জাপানীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া নূতন এক শিক্ষা গ্রহণ করিলাম। কালই আবার এক রেল-লাইন ধ্বংস করিয়া জাপানীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে অচল করিবার নূতন এক পন্থা জানিলাম। এইভাবেই দিনের পর দিন গরিলাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা মিলিতে থাকে।

(৩) রক্ষীদলের সহিত স্থায়ী-সৈন্যদলের যোগাযোগ অত্যন্ত আবশ্যক। বিলাতে রক্ষীদলের সহিত প্রতি ঘাঁটির

স্থায়ী-সৈন্যদলের হেড-কোয়ার্টারের টেলিফোন সাহায্যে যোগা-যোগ রাখার চেষ্টা চলিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল, স্থায়ী-সৈন্য যাহাতে রক্ষীদলকে মুহূর্ত মাঝে সাহায্য দিতে পারে। বিলাত ছোট দেশ হওয়ায় এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালো থাকায় তাহা সম্ভব। কিন্তু ভারতের মতো বিস্তীর্ণ ও স্বল্প রাস্তাঘাটসম্পন্ন দেশে এই পরিকল্পনায় শত্রুকে রুখিতে যাওয়া প্রায় স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইবে। স্থানীয় রক্ষীদলেরা অবশ্য একাকী ছোট ছোট প্যারাসুট সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করিবার সাহস করিতে পারে। কিন্তু আমরা ভুলি না যেন, শত্রুরা আজ উড়ো-জাহাজের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে ৬।৭ টনের ট্যাঙ্ক নামাইয়া চারিদিকে অগ্রসর হইতে পারে। সেনাপতি ওয়াভেল পূর্বভারতে কিছু দূর অন্তর অন্তর ঘাঁটি করিবার পরিকল্পনা জানাইয়াছিলেন। অবশ্য এই ঘাঁটির সাহায্য ও সুবিধা সম্মুখ-মহড়ার সৈন্যদলেরা পাইতে পারে; কিন্তু শত শত মাইল পশ্চাতে বিচ্ছিন্ন গ্রাম-কেন্দ্রে রক্ষীদল কতটা পাইবে তাহা সন্দেহজনক। কাজেই আমাদের নীতি হইবে—শত্রু আসিতেছে, আসিতে দাও; তাহার অগ্রগতির সম্মুখে স্বল্প অস্ত্রে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ছোট ছোট দলকে নিশ্চিহ্ন হইতে দিয়া লাভ নাই। শত্রুকে আসিতে দাও—কিন্তু আমার দেশ দীর্ঘ ও বনাকীর্ণ। এই সুদীর্ঘ স্থান জুড়িয়া শত্রুকে তাহার যাতায়াত-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে হইবে। ইহা দীর্ঘ ও দুর্গম

বলিয়াই সে ব্যবস্থা দুর্বল হইতে বাধ্য। সেই দুর্বল স্থানে আচম্বিতে মরণ আঘাত হানো। আঘাত হানিয়াই পালাও, আবার মুহূর্তমাঝে দ্বিতীয় দুর্বল স্থানে ঝাঁপাইয়া পড়ো। ভারতের মাটিতে ইহাই একমাত্র পথ। ইহাই গরিলা যুদ্ধ।

কিন্তু রক্ষীদল ও গরিলাদলের সর্বাপেক্ষা বড় প্রভেদ হইতেছে—রক্ষীদলের ভিত্তি আত্মরক্ষামূলক এবং গরিলাদলের ভিত্তি আক্রমণমূলক। বিলাতের রক্ষীদলের শিক্ষা বিষয়ক যে সকল পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী রক্ষী-দলের যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে এই কথাই ফুটিয়া উঠি-য়াছে। রক্ষীদলেরা তাহাদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করিবে এবং তাহাদের গ্রাম ও সহরকে আগল দিবার কথাই ভাবিবে। তাহাদের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের অন্যত্র কোথাও লইয়া যাওয়া হইবে না।

"An idea has arisen that in no circumstances will Home-Guard units be asked to leave their own neighbourhood. The impression is that the Home-Guardsman is for the defence of his own home. Again, forming defence in depth the Home-Guard has given rise to the theory that at no time must the local platoon or company be moved to another area, so leaving its own undefended."

—The Home-Guard Encyclopedia,—by A. G. Elliot.

'শত্রুকে যেখানে যেভাবে পারো, তাহার দুর্বলস্থানে আঘাত করিয়া মারো'—এই আক্রমণমুখী আবেগ রক্ষীদল গঠনের মধ্যে

যেন কোথাও খুঁজিয়া পাই না! শত্রু অতি শক্তিশালী ; অতএব তোমার গ্রাম দিয়া যদি শত্রুর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহু প্রবেশ করে, তবে তাহাতে তোমার যেন কিছু করিবার রহিল না ; কিন্তু গরিলা-যোদ্ধা বলিবে—শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখ হইতে পালাও, এবং পরমুহূর্তে তাহার দুর্বল স্থানে ঝাঁপাইয়া পড়ো। আজ তোমার গৃহ, তোমার গ্রাম রক্ষা করাই বড় কথা নয়। শত্রুর মোট শক্তিকে যেভাবেই পারো এবং যেখানেই পারো নিঃশেষ করো। আজ তোমার গ্রাম বেদখল হইলেও, শত্রুর সংহত শক্তি যদি তোমার আঘাতে কোনো দিন কোনো ভাবে শিথিল হইয়া আসে, তবে তোমার গ্রাম রক্ষা পাইবে। আজ গৃহরক্ষীদলের নিছক আত্মরক্ষার নীতি অপেক্ষা গরিলাদলের অদম্য আক্রমণের নীতিই অধিকতর কার্যকরী হইবে।

এত প্রভেদ থাকিলেও সরকার হইতে যে-গৃহরক্ষীদলের আহ্বান আসিয়াছে তাহাকে অবহেলা করিয়া লাভ নাই। আজ ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া আমরা গ্রামে-গ্রামে রক্ষীদল সৃষ্টি করিব। শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি হইবামাত্র এই রক্ষীদল আপন উদ্যমে গরিলা-নীতিই গ্রহণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বর্তমান যুদ্ধে গাড়োয়ার কীর্তি

(১)

উত্তর-চীনের গরিলাবাহিনী

১৯৩৭ সাল। সেদিন ৭ই জুলাই। রাত তখনও শেষ হয় নাই। হঠাৎ চারিদিক হইতে কামানের গর্জন পিপিং সহরকে কাঁপাইয়া তুলিল। দিনের আলোকে কী জানি দেখিতে হইবে—সবাই ভয়ে কাঁপিতেছে। ভোরের ক্ষীণ আলোকে জানালার ফাঁক দিয়া সবাই দেখিল, জাপানী সৈন্যে রাস্তা ছাইয়া গিয়াছে। জাপানীরা চীনকে আক্রমণ করিবার জন্য অজুহাতের সন্ধানে ছিল। কোন-একজন জাপানীকে নাকি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। জাপানীরা এই অপমান সহ্য করিবে না। তাহারা সারা সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে চায়। বিশাল সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে; মার্কোপোলো সেতু ভাঙিয়া চীনের ২৯নং সৈন্যদলকে নির্মূল করিয়া তাহারা পিপিং সহর দখল করিল।

পরদিন। একটি চাষী বুড়ী বাজার করিতে আসিয়াছে। মুখের ভাঙন দেখিয়া মনে হয়, বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে। চোখের কোটর দুটা যেন দুটা গর্ত। ধুসর ও পাতলা চুলগুলি পিছন দিকে টানিয়া বাঁধা। চুলের ফাঁকে ফাঁকে মাথার পীত

চামড়া দেখা যায়। টেবিলের উপর গলা বাড়াইয়া চুপি চুপি দোকানদারকে কী-যেন খুব ব্যগ্রভাবে বলিতেছে। বুড়ী চট্ করিয়া এক গোছা নোট দোকানীর হাতে দিল ও সেই সাথে কাগজে বাঁধা বড় একটি পোঁটলা তাহার বাস্কেটের মধ্যে ফেলিয়া সাঁই করিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

সহরের একটি ছোট বাড়ীর দরজা ঠক্ ঠক্ করিয়া ওঠে। দরজা খুলিবার সাথেই আবার বন্ধ হইল। তাহার বৃদ্ধ স্বামী, দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে এবং আরও পাঁচজন বন্ধু সেখানে বসিয়া আছে। বুড়ীর পোঁটলা খুলিয়া সবাই দেখে—দশটি বড় পিস্তল।

কে জানিত, এই ছোট্ট সংসারকে ঘিরিয়া একদিন উত্তর-চীনে দশ হাজার গরিলা-সৈন্য গড়িয়া উঠিবে! কে জানিত এই দশটি পিস্তলকে কেন্দ্র করিয়া একদিন চীনের পাহাড় প্রান্তরে হাজার হাজার রাইফেলধারী চীন-সৈন্য জাপানীদের ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিতে থাকিবে! এই বুড়ীর বড়ছেলের নাম চাও তুং। চাও তুং আজ উত্তর-চীনের বিশাল গরিলাবাহিনীর অধিনায়ক। আর এই বুড়ী—যে একদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার এই ছোট্ট সংসারের বুকের মধ্যে রাখিয়া শিশু-গরিলাদলকে লালন-পালন করিয়াছিল, সে আজ মাদাম চাও বলিয়া পরিচিত। সমস্ত গরিলাবাহিনী আজ তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে।

উত্তর-চীনের গরিলাবাহিনী

ছোট্ট বাড়ীতে বসিয়া সবাই মাথা ঘামাইতেছে, কেমন করিয়া তাহারা এই   লইয়া সহর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। হঠাৎ তাহাদের মাথায় খেলিল, কলেজের বাস এখনও যখন সহরের বাহিরে যায় তখন তাহাদের কেহ কিছু বলে না। তাহারা কয়েকজনে কিছু অস্ত্র লইয়া সেই পথে বাহির হইয়া পড়িল। এদিকে বুড়ী ও তাহার তুই মেয়ে কাপড়ের নীচে শক্ত করিয়া বাকি পিস্তলগুলি বাঁধিয়া লইয়া রিক্সায় উঠিল। রিক্সার গদির নীচে এক হাজার গুলিভরা বাক্সটি লুকানো আছে। সহরের পশ্চিম পথ দিয়া যখন তাহারা যাইতেছে তখন একজন সান্ত্রী বাধা দিল। বুড়ী সান্ত্রীর প্রশ্নের আগেভাগেই বলিয়া বসে, "তোমাদের আর কি কাজ নেই! এক অথর্ব বুড়ী ও তুটি কচি মেয়েকেও তোমরা সন্দেহ করছ?" —থতমত খাইয়া সান্ত্রীরা পথ ছাড়িয়া দেয়।

সহর হইতে আট মাইল দূরে এক স্কুলগৃহে তাহারা সকলে জমা হইয়াছে। কিন্তু এমনভাবে সহরের আশে-পাশে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ, যদি জাপানীরা ধরিতে পারে তবে শত্রু ভাবিয়া গুলী করিয়া মারিবে; আবার যদি চীন-সৈন্যরাও ধরিতে পারে, তবে তাহারা সাদা পোষাকে জাপানী খয়ের-খাঁর দল মনে করিয়া মারিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। অন্য উপায় না দেখিয়া তাহারা সবাই এমন ভাবে সাজ-পোষাক করিল যেন তাহারা পাহাড় অঞ্চলে খনিজ

পদার্থ বিষয়ে গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে চলিয়াছে। সঙ্গে কিছু বই-পত্র ও ম্যাপও জুটাইয়া লইল। কেহ যদি তাহাদের ধরে তাহা হইলে বলিবে, বন্য জন্তুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা এত পিস্তল সঙ্গে লইয়াছে। এমনি ভাবে তাহারা তয়াঙচেঙ গ্রামে আসিয়া হাজির হইল। এখানে যে গ্রাম্য মাতব্বর ছিল তাহার সাথে এদের পূর্বেই পরিচয় আছে। মাতব্বর এদের আটটি বন্দুক দিল। ইতিমধ্যে এদের দলে পিপিং হইতে কিছু ছাত্র আসিয়া যোগ দিয়াছে এবং স্থানীয় গ্রাম হইতে কয়েকজন চাষীও এদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দল ভারি করিয়াছে। দলেতে মোট সংখ্যা এখন ২৪। তাদের অস্ত্র—১০টি পিস্তল ও ৮টি বন্দুক। কিন্তু এত অল্প অস্ত্রে চলিবে না। আরও অন্তত ছয়টি বন্দুক চাই। জানা গেল, কিছু দূরে হুপে জেলার পূর্ব অংশে জাপানী তাঁবেদার সরকারের অধীনে ২০ জন লইয়া গঠিত এক শান্তি-রক্ষক বাহিনী আছে। কিন্তু তাহারা যথাস্থানে আসিয়া দেখে, মাত্র তিনজন বন্দুকধারী লোক। সেই তিনজন ভয়েই তাহাদের হাতে অস্ত্র দিয়া দিল। উত্তর-চীনের গরিলা-বাহিনীদের ইহাই প্রথম "যুদ্ধ"।

কিছুদিন চুপচাপ। জাপানীরা শীঘ্রই শান্তির প্রস্তাব আনিবে বলিয়া প্রচার করিতেছে। ফলে, ভয়ে ও আশায় দেশের লোকে কোনো দিকেই যোগ দিতে চাহিতেছে না। এই

দলের সবাই গ্রামে গ্রামে জাপানীর মূল উদ্দেশ্য ও মতলব কী তাহা প্রচার করিতে লাগিল। তখন তাহারা য়ুঙ্গান গ্রামে। চাষীরা তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইল। কিন্তু গ্রামের জমিদারের মনে আশঙ্কা হইল যে, হয়ত ইহারা চাষী-বিদ্রোহ করিতে চায়। আক্রোশভবে সে এই দলের সব খবর জাপানীদের জানাইয়া দিল। গরিলাদল যখন প্রথম এখানে আশ্রয় নেয়, তখন তাহারা গ্রামের প্রবেশপথে পাহারা বসাইয়াছিল। হঠাৎ মুশলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। অনর্থক ভিজিয়া অসুখ করিয়া লাভ নাই ভাবিয়া তাহারা আর পাহারা রাখিল না। জমিদার-যে সব খবর বিপক্ষে জানাইয়া দিয়াছে তাহা জানা নাই। দেখিতে দেখিতে শেষরাত্রে ৫০ জন জাপানী তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। তখনও তাহারা ঘুমে বিভোর। গুলীর আওয়াজে জাগিয়া উঠিতে উঠিতে ৪ জন মারা গেল, ২ জন জখম হইল। একজন বাহিরে ছিল, শত্রুরা তাহাকে ছোরা মারিয়া শেষ করে। পালাইবার পথ নাই। পিছনে মাটির দেওয়াল, গরিলারা বুঝিল নিশ্চয়ই সেদিকে কোনো জাপানী পাহারা নাই। সামনে মাটির উপর শুইয়া কয়েকজনে গুলী চালাইতে লাগে, আর বাকি কয়জনে সেই অবসরে দেওয়ালের ভিত খুঁড়িতে লাগে। দেওয়াল প্রায় আলগা হইয়া আসিয়াছে। আর দেরী করা সম্ভব নয়; সবাই দেওয়ালে কাঁধ বাধাইয়া ধাক্কা মারে।

দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ে ; পালাইবার পথ মিলিল। পালাইবার আগে তাহারা সবাই ঠিক করিয়াছিল, যে যেদিক দিয়া পারে মিওফাঙ্গসানে মিলিত হইবে।

মিওফাঙ্গসানে যখন তাহারা পৌঁছিল তখন তাহাদের সংখ্যা মাত্র আঠারো। তাহাদের মধ্যে আবার অনেকে বিহ্বল হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতে চাহিল। অনেকেই দল ছাড়িয়া পালাইল। যাহারা রহিল তাহারাও সবাই নৈরাশ্যে দমিয়া গিয়াছে। একবার তাহাদের মনে হয়, অস্ত্রপাতি যাহা আছে সব মাটিতে পুঁতিয়া পিপিঙে রওনা হইবে। শেষ পযন্ত স্থির হইল, চাও তুঙ পিপিঙে গিয়া দেখিবে, অবস্থা কোথায় দাঁড়াইয়াছে এবং সম্ভব হইলে আরও অস্ত্রপাতি ও বিপ্লবীদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, চাও তুঙ ফিরিতেছে না। সবার মুখে একটা নৈরাশ্যের ছায়া! এমন সময় তাহারা দেখে, দূরে মাদাম চাও ও চাও তুঙ। তাদের সাথে অনেক বিছানাপত্র ; সবাই আসিয়া বুঝিতে পারিল এবং বিছানা খুলিল। খুলিবার সাথেই দেখা যায় তাহারা তিনটি মেসিন গান, ২০টি রাইফেল, চারটি পিস্তল এবং অজস্র গুলী আনিয়াছে। সবার মুখে আনন্দ আর ধরে না। আশ্চর্য হইয়া তাহারা মার কাছে গল্প শুনিতে চায়, কেমন করিয়া এত অস্ত্র আনা সম্ভব হইল। মাদাম চাও বলিতে লাগিলেন, "একজন ধনী মাঞ্চুকো আমাকে ছয় হাজার টাকা দেয়, আর বাকি তিন হাজার টাকা বন্ধুদের কাছ থেকে

চাঁদা তুলে আদায় করি। টাকা সাথে ক'রে নিয়ে দোকানে গিয়েছি, দোকানদার মেয়েলোক দেখে টাকা মারবার ফিকির খুঁজছে। আমাকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে বলল —'আমি জানি তোমার ছেলে জাপানীর বিরুদ্ধে লড়ছে। যদি তুমি আমাকে এখন সব টাকা না দাও তবে আমি জাপানীদের কাছে তোমাদের কথা সব ব'লে দেব।' বেগতিক দেখে আমি দোকানীকে গুরুগম্ভীর ও স্থিরভাবে বললাম, বেশ আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, তবে জেনে রেখো, আমার ছেলেকে জাপানীরা কোনো দিনই ধরতে পারবে না; আমিও মরবার জন্য ভীত নই; তবে মরবার আগে জাপানীদের ব'লে যাবো যে, এই দোকানীই বরাবর গরিলাদের অস্ত্র জুগিয়ে আসছে। সে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়লো, তার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় কথা বেরুল না। আমি নোট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।"—গল্প শুনিয়া সমস্ত পাহাড় গরিলাদের হাসিতে কাঁপিয়া উঠিল।

এবার আর বিপ্লবীদের অস্ত্রের অভাব নাই। আশ-পাশের গ্রাম হইতে আরও কয়েকটি বন্দুক জোগাড় হইল। বিপ্লবীদের সংখ্যাও বাড়িতেছে। ইতিমধ্যে পিপিঙ হইতে ২০ জন ছাত্র আসিয়া যোগ দিয়াছে। সবাই মিলিয়া চল্লিশে দাঁড়াইয়াছে। একত্রে বসিয়া তাহারা দলের নাম দিল "জাপবিরোধী প্রথম গণবাহিনী।" আর, দলের সকলের সম্মতিক্রমে তাহাদের নেতা সাব্যস্ত হইল—চাও তুঙ।

পিপিঙের কথা তাহারা ভুলিতে পারিতেছে না। এখানেই আঘাত হানিয়া তাহারা জানাইয়া দিবে যে, জাপানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য চীনের বিপ্লবীদল এখনও বাঁচিয়া আছে। সহরের পাশেই একটি জেলখানা। জেলে এখন তাহাদের অনেক বন্ধু আটক পড়িয়া আছে। অনেকে ফাঁসির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইখানেই আঘাত করিতে হইবে।

তখন গভীর রাত। দূরে দুই রাস্তার মোড়ে কয়েক জন পাহারা রাখা হইল—জাপানী সৈন্যদের আসিতে দেখিলেই তাহারা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিবে। বাকি সবাই দুই দলে ভাগ হইয়া জেলের দুইদিক ধরিয়া অগ্রসর হইল। সম্মুখের দলে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে একজন জাপানী ভাষা জানিত। তাহার কাছ হইতে গুটিকয়েক মামুলি জাপানী কথা অন্য সবাই জানিয়া লইল। তাহারা আগুয়ান হইয়া আসিতেছে। সামনে একটি ভিখিরী ছেলে। হাতে দুটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে বলা হইল, সে যেন ছুটিয়া গিয়া জেলের সিপাহীদের বলে,—জাপানী অফিসাররা জেল দেখিতে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে দলটি জেল-গেটের সামনে হাজির। তাহারা সবাই যা দু-একটা জাপানী কথা শিখিয়াছিল, সেগুলি পরস্পরে কথোপকথন ছলে বলিতে লাগে।

জাপানী সিপাহী ভাবিল, হাঁ, সত্যই তো জাপানী সেনাপতি। ফটকের দরজা খুলিয়া সে তাহাদের অভ্যর্থনা

জানায়। মুহূর্তের মাঝে তাহার কপালের কাছে পিস্তল ধরিয়া তাহার নিকট হইতে জেলের চাবিগুলি হস্তগত করা হইল। অফিসঘরে টেলিফোনের তার কাটিয়া ফেলিতে একটুও দেরী হইল না। সিপাহীরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; ভয় দেখাইয়া তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। চাও তুঙ জেলের ভিতরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "আমরা জাপানী নয়! আমরা বিপ্লবী, তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি; গারদ ভেঙে সব বেরিয়ে এসো।" বারুদখানা ভাঙিয়া তিনটি মেসিনগান, ৩৫টি রাইফেল এবং অনেকগুলি পিস্তল মিলিল। আটক-বন্দীর অধিকাংশই দলে যোগ দিল। যে যাহা পারিল, সব অস্ত্রপাতি লইয়া তড়িৎবেগে সহর হইতে উধাও হইল।

আরও এক মাস পার হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের মোট সংখ্যা ৪০০ দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্রের অভাব তাহাদের আর নাই। এবার তাহারা মন দিল, গ্রামের চাষীর দিকে। তাহাদের বুঝাইতে লাগিল, তাহাদের অসংখ্য দুঃখের বোঝা লাঘব করিতে হইলে যে-সমাজব্যবস্থা আনিতে হইবে, তাহার জন্য চাই স্বাধীনতা। সর্বপ্রথম জাপানীদের তাড়াইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নূতন ব্যবস্থা কেমন ও তার রূপ কী, তাহাও তাহাদের জানাইতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট

নাটক অভিনয় করিয়া, জাপানীর অত্যাচারকে ও তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র পথকে তাহারা অজ্ঞ চাষীদের বুঝাইয়া দেয়।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর শেষ হইতে চলিল। আজ একটি দল নয়, দুটি দল নয়, হুপে প্রদেশের গ্রামে গ্রামে শত শত ছোট গরিলাদল জন্ম লইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা এখন ২০,০০০ বিশ হাজারে উঠিয়াছে। এতবড় দলকে একত্রে কাজে লাগাইতে অনেক সমস্যা দেখা দিল। এমনি সময়ে নানকাও পর্বতে অষ্টম রুট আর্মির (লালফৌজ) নেতা চুটের নিকট হইতে একটি চিঠি আসিল। চুটে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে এদের এক দীর্ঘ উপদেশ দিয়াছেন, কেমন করিয়া এদের পক্ষে লালফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া চীনের গোটা যুদ্ধটা একটা অখণ্ড পরিকল্পনায় চালানো সম্ভব। চাও তুঙ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার স্বপ্ন এতদিনে পূর্ণ হইল। সেদিন ১৯৩৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর।

চীনা-গরিলার ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত হইল। লালফৌজের সাহায্যে ও আশ্রয়ে চাও তুঙের দল তখন হইতে দিনের পর দিন উত্তর চীনের প্রান্তরে প্রান্তরে নিত্য নূতন দুর্ধর্ষ কাহিনী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে জাপানী সৈন্যদল তাহাদের যান্ত্রিকবাহিনীকে রেলপথ ধরিয়া সজোরে চীনের বুকে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হইয়াছে সত্য, কিন্তু

উত্তর-চীনের গরিলাবাহিনী

সুসংবদ্ধ এই গরিলাদলগুলি জাপানী সৈন্যদলকে রেল অঞ্চলেই যেন নাগপাশের বন্ধনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পূর্ব চীনে সানসি প্রদেশে এই নাগপাশের বন্ধন কী ভাবে জাপানী শক্তিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে এবং কী ভাবে তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, পর পৃষ্ঠায় সংযোজিত মানচিত্র হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

গরিলা অঞ্চল
চীনা শক্তি
জাপানী শক্তি

(২)
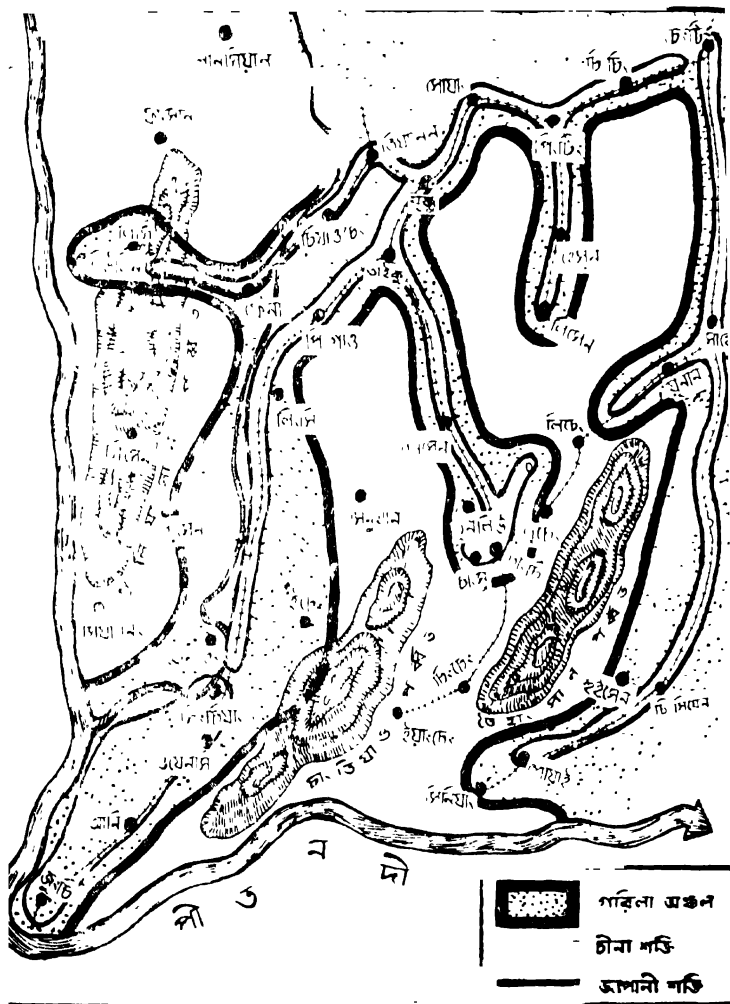
সোভিয়েট গরিলা যুদ্ধের এক পৃষ্ঠা

ছোট একদল লালফৌজ। গেলিটস্কি তাহাদের নেতা। গত বৎসর যখন জার্মাণীরা সোভিয়েটকে আক্রমণ করে, তখন সর্বপ্রথম তাহাদের বাধা দিবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয় তাহাদের মধ্যে এরাও ছিল। জার্মাণীর সাঁড়াশী আক্রমণে এরাই সর্বপ্রথম আট্‌কা পড়ে। গেলিটস্কি যখন দেখিলেন, চারিদিকের পথ অবরুদ্ধ তখন তাঁহার সৈন্যকে—ছোট ছোট দলে, যে যেভাবে পারে—জার্মাণ লাইন ভেদ করিয়া পিছনে প্রধান লালফৌজের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আদেশ দিলেন। এই দলগুলি ধীরে ধীরে গরিলা-নীতিতে জার্মাণ সৈন্যের পশ্চাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বন, বিল, বাওড় ভাঙিয়া একমাস পরে লালফৌজের সহিত মিলিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই একমাসে তাহারা স্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই ইতি-হাসের দুই-একটি ঘটনা এখানে আমরা বর্ণনা করিব।

১লা জুলাই। দলটি এখন এক বনের মধ্যে আশ্রয় লই-য়াছে। ভোর হইয়া আসিয়াছে। তিন-চার মাইল দূর হইতে ঘড়্ ঘড়্ করিয়া কয়েকখানা উড়োজাহাজের শব্দ কানে

আসিল। গেলিটস্কি অনুসন্ধানের জন্য কয়েকজনকে পাঠাই-লেন। তাহারা আসিয়া জানাইল, কিছুদূরে বনের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা স্থান আছে; সেখানেই নাৎসীদের কয়েকখানা উড়োজাহাজ দুই একবার ঘুরিয়া গেল। গেলিটস্কির মাথায় মতলব খেলিয়া যায়। আদেশ অনুযায়ী সকলেই ফাঁকা স্থানের চারিপাশে এখানে-সেখানে ঝোপের আড়ালে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষায় রহিল। জার্মাণীর নয়খানা সৈন্যবাহী উড়োজাহাজ দেখিতে দেখিতে আসিয়া হাজির। বিমানগুলি নিশ্চিন্ত মনে মাত্র ১২০০ ফিট উপর দিয়াই ঘুরিতেছে। হঠাৎ একটি বিমানের খোলটা খুলিয়া যেন খানিকটা ধোঁয়া বাহিরে আসে। ঝোপের আড়াল হইতে লালফৌজেরা ভাবে, হয়ত-বা উড়োজাহাজে আগুন লাগিয়াছে। কিন্তু চমক ভাঙিল, ধূসর পোষাকে নাৎসীরা নামিতেছে। বন্দুকের ঘোড়ায় লালফৌজদের আঙ্গুলগুলি চঞ্চল হইয়া উঠে। ধীরে ধীরে ১৫ জন, ৫০ জন, ১০০ জন, ১৪০ জন প্যারাস্যুট খুলিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। তবুও গুলীর আদেশ আসে না। এবার তাহারা একশত হাতের মধ্যে নামিয়াছে। 'গুড়ম'! কাপ্তেনের আদেশ মিলিল। সমস্ত বন কাঁপাইয়া গুলীর পর গুলী চলিল। ছিন্নভিন্ন প্যারাস্যুট লইয়া নাৎসীরা মাটিতে পড়িল। কেহ মরিল, কেহ পড়িয়া উঠিল না, কেহ পড়িয়া বন্দুক চালাইতে চাহিল।

সোভিয়েট গরিলা যুদ্ধের এক পৃষ্ঠা

লালফৌজের আর্মার্ডগাড়ী বন হইতে দৈত্যের মতো বাহির হয়। ৮০ জন নাৎসী ধরাশায়ী, বাকিগুলি বৃথাই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বনের আশ্রয় খুঁজিতে ব্যস্ত। অবরুদ্ধ লাল-ফৌজকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা এবারের মতো ব্যর্থ হইল।

*   *   *

লালফৌজের দুইজন সিগনালী সৈন্য লিঙ্কো ও লুকাচ। রাস্তার অন্য পার্শ্বে একটা ছোট দলের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। টেলিফোনের তার পিঠে করিয়া তাহারা চলিয়াছে। রাস্তার উপর দিয়া তার ফেলা হইয়াছে; এমন সময় দেখা গেল, একজন জার্মাণ সৈন্য মোটর সাইকেল চালাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। রাস্তার দুপাশের গাছের উপর দিয়া তারটি বাঁধিয়া লিঙ্কো ও লুকাচ ড্রেনের খাদে লুকাইয়া বসিয়া থাকে। তার দেখিয়া মোটর সাইকেল থামিয়া গেল। নাৎসী যোদ্ধাটি বিড়-বিড় করিয়া গালাগালি দেয় আর ভাবে, হয়ত ইহা জার্মাণ সৈন্যের তার। ধীরে ধীরে তার ঠেলিয়া সে আবার ছুটিয়া চলিল। রাগে অন্যমনস্ক হইয়া সে দেখিল না যে, তারের সহিত কয়েকখানা কাগজ জড়াইয়া গিয়াছে। লিঙ্কো ঠাট্টা করিয়া বলে, "দেখলে বন্ধু, জার্মাণটি আমাদের কাজে বিরক্ত হয়ে কী-যেন লিখে রেখে গেল!"

লুকাচ বলে—"না বন্ধু, এবার যখন কাগজগুলো নিতে সে ফিরে আসবে তাকে নিশ্চয় আমরা সন্তুষ্ট করব!"

বন্ধু দুইটি তাহাদের মতলব মতো দুই-তিনবার রিহার্সাল দিয়া লইল। জার্মাণ সৈন্যটি তীরবেগে মোটর সাইকেলে ছুটিয়া আসিতেছে। এবার টেলিফোনের তারটি মাটির সাথে মিশানো আছে। হঠাৎ লুকাচ ইঙ্গিত করিল। দুইজনেই তার টানিয়া ঠিকমতো উচুঁ করিল। তারে গলা বাধিয়া জার্মাণ-যোদ্ধা ধরাশায়ী! শিকার মিলিয়াছে। ব্যাঘ্র যেমন শিকারকে তাহার আশ্রয়ে লইয়া যায়, লিঙ্কো ও লুকাচ তেমনি তাহাদের শত্রুকে, মোটর সাইকেলটি ও চিঠিপত্রগুলি সমেত লাল-ফৌজের আড্ডায় আনিয়া হাজির করিল।

* * *

২রা জুলাই। রাত্রের অন্ধকারে লালফৌজের এই দলটি ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দূরে ভীষণ আগুন দেখা দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুলীর আওয়াজ। দলের টহলদারীরা খবর সন্ধানে ছুটিয়া চলিল। পথে গ্রামবাসী ভেরোভা ও পেরলভের সঙ্গে দেখা। তাহাদের পরণের পোষাক আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, তাহারা সকলেই প্রায় উলঙ্গসমান। গ্রাম-বাসীরা জানায়, আজ রাত্রে ৩০০ জার্মাণ সৈন্য গ্রামে চড়াও হইয়া সমস্ত খাবার কাড়িয়া লইতেছিল, এমন সময় তাহারা দেখিতে পায় যে, পেরলভের বাড়ীতে ১২ জন লালফৌজ লুকানো আছে। জার্মাণরা আক্রোশে তাহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া চারিদিক হইতে বন্দুক তাক্ করিয়া সেই ঘরে আগুন

লাগাইয়া দেয়। দগ্ধ ঘর হইতে যে-কেহ পালাইতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। পেরেলভ ও ভেরোভা কোনমতে পালাইয়া আসিয়াছে। শুনিবা মাত্র লালফৌজের দল সঙ্কল্প করিল, পশুকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

৩রা জুলাই ; সকলেই ভাবিতেছে, কী করা সম্ভব। রাত্রি তখন গভীর। একটি বৃদ্ধ চাষী আসিয়া হাজির। সমস্ত কাপড় দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সে অন্ধকারে এক পুকুরে বসিয়া জার্মাণদের লক্ষ্য করিতেছিল। শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল, জার্মাণরা গ্রামের এক মদের দোকান লুঠ করিয়া সমস্ত মদ খাইয়া প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় গড়াগড়ি দিতেছে। গেলিটস্কি আনন্দে অধীর ! সুযোগ মিলিয়াছে। আর দেরী নয়, অন্ধকারে বন্দুক-ঘাড়ে সকলেই ছুটিল। বন জঙ্গল ভেদ করিয়া পাঁচ মাইল দূরে যথাস্থানে তাহারা পৌঁছায়। দেখিতে দেখিতে লালফৌজের হঠাৎ আক্রমণে নাৎসীদল কেহ প্রাণ খোয়াইল, কেহ পালাইতে দিশা পাইল না। বৃদ্ধ চাষীটিও সঙ্গে আসিয়াছে। দূর হইতে দেখা গেল, সে তাহার রাম-দা উদ্যত করিয়া একটা নাৎসীকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে। নাৎসীটা জুতা পরিবার অবসর পায় নাই ; এক পায়ে এক বুট পরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রাণের ভয়ে ছুটিতেছে। বৃদ্ধের শিথিল হাতের রাম-দা ঝপাৎ

করিয়া নাৎসীর মাথাটা ধূলায় লুটাইয়া দিল। বৃদ্ধের পরণে সেই ভিজা কাপড় হইতে তখনও জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

*　　　*　　　*

৬ই জুলাই। গেলিটস্কি সকলকেই জানাইলেন, জার্মাণ লাইন চারিদিক হইতে আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না। সম্মুখে একটি বড় রাস্তা। এই রাস্তায় অনবরত শত্রুর যানবাহন যাতায়াত করিতেছে এবং রাস্তাকে শত্রুরা ভালোভাবেই পাহারা দিতেছে। ইহাকে কোনমতে অতিক্রম করিতে পারিলে, ওপারে বনের আশ্রয় মিলিবে। বেলা তখন তিনটা। সেদিন খুব মেঘ করিয়াছে। রাত্রের অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। এই অন্ধকারে তিন মাইল চুপে চুপে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনটি দলে সৈন্যরা ভাগ হইয়া এক-পা দুই-পা করিয়া চলে। রাত্রির অন্ধকারে রাস্তার অতি নিকট হইতে হঠাৎ অসংখ্য হাত-বোমা দিগন্ত কাঁপাইয়া গর্জিয়া উঠিল। নাৎসীরা সংখ্যায় অধিক থাকায় নিশ্চিন্ত মনে কেহ ঘুমাইতেছিল, কেহ ঝিমাইতেছিল। তাহারা চমক ভাঙিয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে নানা স্থান দিয়া লালফৌজ রাস্তা অতিক্রম করিল। রাত্রের অন্ধকারে নাৎসীরা গুলী চালাইতে ওস্তাদ নহে; ফলে লালফৌজের অতি সামান্যই ক্ষতি হইল।

এই ছোট ছোট দলগুলিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে অনেক দূরে বনের আশ্রয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হইবার আদেশ দেওয়া ছিল। একটি দল হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ পায়ে সাপের মতো কী যেন অনুভব করে। ভালো করিয়া দেখে, নাৎসীদের টেলিগ্রাফের অনেকগুলি মোটা তার চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের একজন বোকার মতো তার কাটিতে ব্যস্ত হইল। উপরের রবার কাটিয়া ভিতরের তার স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিক শকে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দলের মধ্যে গলেটভ বলিল, "তোমরা জানো না, দেখ কী করিয়া ইলেক্‌ট্রিক তার কাটিতে হয়।" এই বলিয়াই সে ছুটিয়া গিয়া বড় তারটির উপর বসিয়া অন্য তারগুলি কাটিল এবং শেষে বড় তারটিকে নিকটে একটি পুরানো কাঠের সাঁকোর উপর রাখিয়া সাঁকোতে আগুন লাগাইয়া দিল। এই ছিন্ন তারগুলি কত জার্মাণ সৈন্যের যোগাযোগ নষ্ট করিল তাহা কে জানে?

* * *

তার কাটিতে গিয়া এই ছোট দলটি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। সারারাত্র ধরিয়া তাহারা ১৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। সেদিন ৮ই জুলাই। আবার সন্ধ্যা নামিয়াছে। তখন তাহারা এক বনের আশ্রয়ে বিশ্রাম করিতেছে। নির্বিঘ্ন পথে গেলে তাহারা এক বিলের মধ্য দিয়া তিন মাইল

হাঁটিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে। ষ্টাভিন্স দিয়া আরেকটি সোজা পথ আছে। কিন্তু এই পথে গেলে একটি বড় রাস্তা অতিক্রম করিতে হইবে এবং সে-রাস্তা জার্মাণ অধিকারে। তবুও এই সোজাপথে যাওয়াই ঠিক হইল।

দলটি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। রাস্তাটি মাত্র ৫০০ ফিট দূরে। সকলেই এক ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়া কচ্ছপের মতো চলিয়াছে। সকলের আগে চলিয়াছে সিদোরেস্কো। হঠাৎ একদল নাৎসী মোটর-সাইকেল আসিল। তাহাদের একজন নামিয়া ম্যাপ খুলিয়া টর্চের আলোয় কিছুক্ষণ দেখিল। বাকি সকলে সাঁ-সাঁ করিয়া ডান দিকের পথে ছুটিয়া চলিল। নাৎসীটি কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ সিদোরেস্কো ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিয়া ওঠে—"দেখো, এখানে রাস্তাটি দুভাগ হয়েছে। বাঁ দিকের রাস্তাটি আবার ঘুরে জার্মাণদের পিছনে পশ্চিমে চলে গেছে। আর ডান দিকেরটি সোজা সামনে চলে গেছে।"

পলিকভ প্রশ্ন করে, "কিন্তু ঐ জার্মাণটি কী করছে ওখানে?"

উত্তর আসে—"জার্মাণ-গাড়ীগুলিকে ডান দিকের পথ দেখাবার জন্য সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখা যাক, ওরা কী করতে চায়।

সত্যই দেখা গেল, অনতিবিলম্বে অনেকগুলি ট্যাঙ্ক দ্রুত

আসিল এবং ঐ জার্মাণ প্রহরীটি তীব্রবেগে টর্চ নাড়িয়া ট্যাঙ্কগুলিকে ডানদিকে দেখাইয়া দিল। ট্যাঙ্ক চলিয়া যাইবার পর আবার সে চলাফেরা করে ও ম্যাপ দেখে। সিদোরেস্কো শিকারী কুকুরের মতো কান খাড়া করিয়া প্রহরীব কথাগুলি শুনিতে চায়।

সিদোরেস্কো ফিস্-ফিস্ করিয়া বলে—"বাঃ, আচ্ছা প্রহরী!"

সিদোরেস্কো বুকে হাঁটিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া যায়। সকলেই চুপ চাপ। হঠাৎ কী যেন একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ সকলের কানে আসে। তারপর আবার নিঃশব্দ। দুই মিনিট পর আবার প্রহরীকে যথাস্থানে দেখা গেল। সে শিষ দিতেছে এবং টর্চ ঘুরাইতেছে। ঘড়-ঘড় করিয়া কয়েক শত ট্যাঙ্কের আওয়াজ শোনা গেল। সকলেই বুঝিল, জার্মাণীর ট্যাঙ্কবাহিনী ও তৈলবাহী মোটরগুলি আসিতেছে।

জার্মাণ-পোষাক পরিহিত সিদোরেস্কো টর্চ দিয়া গাড়ীগুলিকে থামাইয়া বামদিকের পথে যাইতে ইঙ্গিত করিল। জার্মাণীর বিশাল ট্যাঙ্কবাহিনী পূর্ণ একঘণ্টা ধরিয়া একে একে বাম দিকের ভুল পথে বিশ্বাসভরে চলিয়া গেল। এদিকে লালফৌজের অন্যান্য সকলেই সুযোগ ও ইঙ্গিত বুঝিয়া ডানদিকের পথকে একটু দূরে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ট্যাঙ্কবাহিনী চলিয়া গেলে সিদোরেস্কো ছুটিয়া

আসিয়া দলে যোগ দিল। জার্মাণ ট্যাঙ্কবাহিনী কী ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহা পরদিন ভোরে বুঝা যাইবে। সিদোরেঙ্কো না জানিয়াই হয়ত কোনো এক দুর্বার জার্মাণ-অগ্রগতিকে সামান্য টচের দোলায় অনেক দিনের জন্য পিছাইয়া দিল।

*　　　　*　　　　*

রাশিয়ার গিরিকান্তারে নদীপ্রান্তরে সুবিস্তৃত রণক্ষেত্রে এইরূপ কতশত গরিলারা বিরাট নাৎসীবাহিনীর পশ্চাতে ও অভ্যন্তরে কতশত দুঃসাহসিক ইতিহাসের সৃষ্টি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক দুর্গম স্থানেই লাল গরিলার ছোট ছোট দল রাত্রিদিন কর্মতৎপর হইয়া ঘুরিতেছে। জার্মাণদের স্বস্তি দিবে না—তাহাদের নিস্তার নাই। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাইতেছে সোভিয়েট গরিলাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র দল শত্রুর সন্ধানে এক দুর্গম পাহাড়ে-নদী অতিক্রম করিতেছে।

(৩)
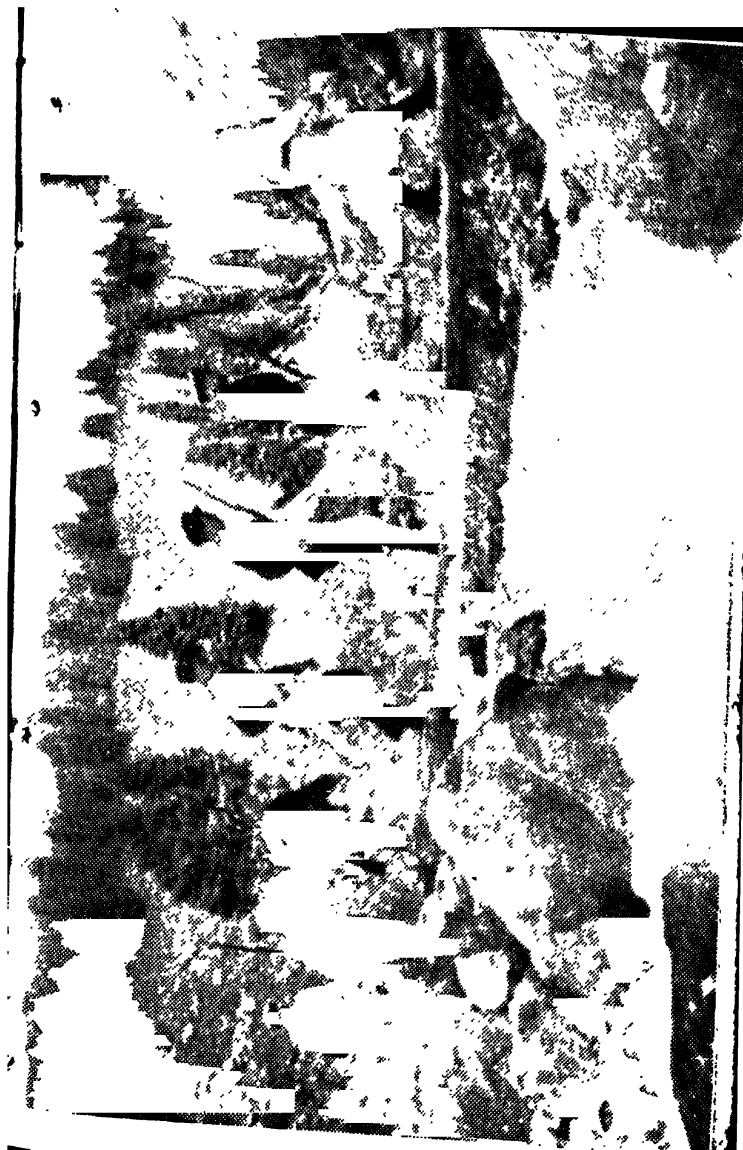
পূর্বদ্বার-প্রহরী চট্টগ্রামের দায়িত্ব

বাঙলার পূর্ব তোরণের দ্বাররক্ষীস্বরূপ চট্টগ্রাম আক্রান্ত হইয়াছে। বীর বাঙালীর আর কথার জাল সৃষ্টি করিবার অবকাশ নাই; বাঙলার চাষীর বুকের রক্তে তাহার মাটির প্রতি কী উন্মত্ত আকর্ষণ আছে তাহাই দেখাইবার সময় আসিয়াছে। এই আকর্ষণ, এই মমতার সম্মুখে যে কোনো ক্ষয় ও ক্ষতি আজ হেয় হইয়া আসিবে। হয় বাঁচিব, না হয় মরিব—এই প্রতিজ্ঞাই আজ বাঙলার চাষী গ্রহণ করুক। যে-মাটি তার সবটুকু রস নিঙড়াইয়া শস্য ক্ষেতকে ফসলে ভরিয়া দিয়াছিল, যে-মাটি ধারালো লাঙল ফলকের মুখে তার বক্ষ চিরিয়া মাতৃবক্ষের মতো আমাকে পুষ্ট করিয়াছে, যে-মাটিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সুখে দুঃখে ভরা গৃহগুলি পিতা-প্রপিতামহের স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে মাটি আমি ছাড়িবনা, এই প্রতিজ্ঞাই বাঙলার চাষী গ্রহণ করো। শত্রুকে আমার গৃহে আশ্রয় দিব না, শত্রুকে আমার ক্ষেতের ফসলে বাঁচিতে দিব না, শত্রুকে আমার গ্রামে প্রবেশ করিতে দিব না—ইহাই আজ বাঙলার চাষীর পণ।

চট্টগ্রামের বোমাবর্ষণ এক নূতন ইঙ্গিত দিয়াছে। ইহার পূর্বে মাদ্রাজ প্রদেশে ও সিংহলে বোমা বর্ষিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সেগুলিকে আমরা ছন্নছাড়া আক্রমণের মধ্যে ফেলিতে পারি। ৭০০।৮০০ মাইলের সাগর ডিঙাইয়া উড়ো জাহাজ-বাহী রণতরীর সাহায্যে এখানে-সেখানে অল্পবিস্তর আঘাত হানা যাইতে পারে; কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো আক্রমণের ফলক প্রবেশ করানো যায় না। চট্টগ্রামের আক্রমণ অন্যরূপ। জাপানীরা একদিকে উত্তর ব্রহ্মে অগ্রসর হইয়া আসামের পূর্ব সীমানায় প্রবেশ করিতে চাহিতেছে; আর একদিকে তাহারা আকিয়াব দখলে আনিয়া যেন বাঙলার বুকে সেই পথে দ্বিতীয় তীক্ষ্ণ ফলক উদ্যত করিয়াছে। এই ফলক সে চট্টলপথে প্রবেশ করাইতে চাহিবে কিনা, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও সম্ভব নহে। তবে চট্টগ্রামের বোমাবর্ষণ তাহারই পূর্বাভাষ রূপে ধরিয়া লইয়া আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

দীর্ঘ যুদ্ধের সুযোগ

জাপান, সে যতই-না বলশালী হউক, যতই-না নূতন রণকৌশলী হউক, তাহাকে ভারত আক্রমণ করিবার পূর্বে দশবার চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের ভারতবর্ষ অতি বিশাল দেশ: সুধু বিশাল নহে, (যতই না আমরা হিন্দুস্থান

পাকিস্থান করি। ইহা সীমানা বর্জিত একটানা দেশ; একবার একপ্রান্ত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে হাজার মাইল ডিঙাইয়া অন্য প্রান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত সৈন্যদলের পক্ষে বিশ্রামের অবকাশ মিলিবে না। এখানে এমন একটা সীমানা মিলিবে না, এমন একটা প্রদেশ মিলিবে না, যেখানে পৌঁছাইয়া কোনো আক্রমণকারী সৈন্যদল বলিতে পারে যে, এইখানেই তাহার যুদ্ধ শেষ, আর অগ্রসর হইতে চাহে না। আসাম দখলে আসিলেই বাঙলা, বাঙলা ছাড়াইলেই বিহার, বিহার অতিক্রম করিতে না করিতে যুক্তপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ছাড়াইয়াই পাঞ্জাব। এই পাঞ্জাব দখলের পর উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশে হাজির হইয়া তবে কোনো সৈন্যদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। বর্তমান যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া আমরা নিশ্চয় ধারণা করিতে পারি, বঙ্গ-আসামের সীমানায় গারো পর্বত বা বঙ্গ-বিহারের সীমানায় রাজমহল পর্বত বর্তমান যান্ত্রিক যোদ্ধার সম্মুখে আপনা হইতেই মাথা নত করিয়া দিবে। সেইজন্য মার্কিণ, বৃটেন এবং ভারতীয় সৈন্যদিগকে নিতান্ত দুর্বল বলিয়া জাপানীরা যদি মনে করিয়াও থাকে, তবুও তাহারা জানে যে আমাদের দীর্ঘ ও একটানা দেশ যুদ্ধকেও দীর্ঘ ও একটানা করিয়া তুলিবে। শুধু চট্টগ্রাম হইতে দিল্লীর পথ দীর্ঘ নয়, দার্জিলিং হইতে সুন্দরবন মাত্র

পাঁচশত মাইল হইতে পারে, কিন্তু বিহারে প্রবেশ করা মাত্র তাহাকে আরেক দীর্ঘ পথের কথা ভাবিতে হইবে। দিল্লীর দিকে মুখ করিয়া অগ্রসর হইলেও তাহাকে বিহার হইতে সিংহল পর্যন্ত অফুরন্ত প্রান্তর হইতে পার্শ্ব-আক্রমণের ভয়ে ভীত হইতে হইবে। ইহাই আবার যুদ্ধকে সুধু দীর্ঘস্থায়ী করিবে না, রণাঙ্গনের পরিধিও বিস্তৃত করিবে।

জাপানীরা তাহাদের সৈন্য-শৃঙ্খল মাঞ্চুকুর প্রান্ত হইতে চীনকে বেড় দিয়া ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে; ইহাকেই যদি পুনরায় টানিয়া আসাম ও বঙ্গ হইতে পাঞ্জাব ও সিংহল পর্যন্ত দশ হাজার মাইলে দীর্ঘ করিতে চায়, তবে তাহাদের সৈন্যের শৃঙ্খলগ্রন্থি শীর্ণ, দুর্বল ও অসংলগ্ন হইয়া আসিবে। জাপানী-যোদ্ধার শিক্ষক ও গুরু জার্মাণ-যোদ্ধারাও এতবড় দীর্ঘ রণাঙ্গণের মুখোমুখী হইতে এখনও সাহসী হয় নাই।

বিস্তৃততম রণাঙ্গণ, অতি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং শত্রুর শীর্ণকায় সৈন্যদল—ইহা অপেক্ষা গরিলাদলের আর কী সুবর্ণ সুযোগ মিলিতে পারে! বাঙলার গরিলাদল, আজ তোমার হাতে অস্ত্র নাই; শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতির সম্মুখে তোমাকে বিনা অস্ত্রে বুক পাতিয়া কেহ মরিতে বলিতেছে না। শত্রু আসিতেছে, আসিতে দাও। আজ সুধু দৃঢ় পণ করো, ইহার প্রতিশোধ লইবই। দুইদিন পরেই তোমার সুযোগ আসিবে। শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া শত্রুকে মারিব—এই প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করো।

দেখিবে, এই দীর্ঘ পথে ও দীর্ঘ রণক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যদল কী ভাবে শীর্ণ হইয়া পড়ে, এই বিস্তৃত রণাঙ্গনে কী ভাবে শত্রুসৈন্যদল বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। এই শীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে গোলাগুলী বন্দুক ও রসদ পাঠাইবার পথগুলিতে কখনই প্রতিপদে প্রহরী বসানো সম্ভব হইবে না। ইহাই তোমার অবসর। সেই মুহূর্তেই তোমাকে মরিয়া হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই প্রতিজ্ঞাই আজ গ্রহণ করো।

চট্টগ্রাম আজ আক্রান্ত। চট্টলবাসি, আজ এই দুর্দিনে তোমাদের বীর যোদ্ধারা তাহাদের দুর্দান্ত সাহসভরা বুকের পাটা লইয়া তোমাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইল না। তাহারা আজও কারারুদ্ধ। বৃটিশ সরকার আজও বুঝিলেন না, এই সিংহসম যোদ্ধাদের ছাড়িয়া দিলে চট্টল বনভূমিতে জাপানী সৈন্যরা জানিয়া যাইত, স্বাধীনতাকামী বাঙালী জাপানীদের কী চক্ষুতে দেখিয়া থাকে, নাৎসী শত্রুকে মারিবার জন্য কী আগুনের খেলা তাহারা খেলিতে পারে। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের জন্য ক্ষোভে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবার অবসর নাই। চট্টলবাসি, জাপানী শত্রুর অগ্রগতির সম্মুখে তোমরা প্রথম প্রহরীর দায়িত্ব লইয়া আজ বাঙলার বুকে আগুন জ্বালো। বুকে সাহস পাইবার আশায় সারা বাঙলা আজ তোমাদের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া আছে।

সৌভাগ্যক্রমে জাপানীরা এমন একটা পথ বাছিয়া লইয়াছে, যেখানে বাঙলার গরিলারা দুর্দান্ত খেলা দেখাইতে পারিবে। তখন প্রথম-মহাযুদ্ধ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। তুর্কী সৈন্যরা সিরিয়ার ভিতর দিয়া প্যালেষ্টাইন ও আরবের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সেনাপতি এলেনবি মিশর হইতে সেনাই উপদ্বীপের পথে তুর্কী সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য পরিকল্পনা করিতেছেন। নগণ্য সৈনিক লরেন্স বেদুইনদের একত্রিত করিয়া তুর্কীকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সকলেই উপহাস করিল। উপহাসকে উপেক্ষা করিয়া লরেন্স স্বাধীনতার আহ্বানে বেদুইনদের উদ্বুদ্ধ করিলেন। তুর্কীসৈন্যদল প্যালেষ্টাইনের পথে দক্ষিণে নামিল। মেদিনার রেলপথ তাহাদের দখলে আসিল। লরেন্স তখন আরবের মরুভূমিতে এই রেল-লাইনের পূর্ব পার্শ্বে ইতস্তত গরিলাদল সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেই বলিল, এই রেল লাইনকে উড়াইয়া দাও, তাহা হইলে তুর্কীরা আর দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারিবে না। লরেন্স বলিলেন— না, এই রেল লাইন ধ্বংস করিলে তুর্কীরা অন্য পথ বাছিয়া অন্যদিকে অগ্রসর হইবে। তাহা অপেক্ষা এই রেল-লাইন উহাদের রাখিতে দাও; মক্কার দিকে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া উহারা এই রেলপথে অজস্র সৈন্য, অজস্র গোলাগুলী, অজস্র খাদ্যসম্ভার পাঠাইবে এবং আমরা সেই সুযোগে গরিলা-নীতিতে

ইহাদের অস্ত্র কাড়িব, ইহাদের সৈন্য ধ্বংস করিব, ইহাদের খাবার কাড়িয়া খাইব। এই নীতির ফলে তুর্কী সৈন্যদল যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী প্যালেষ্টাইন-যুদ্ধে প্রমাণিত হয়।

এই ঘটনার কথা চট্টগ্রামের গরিলাদলের মনে রাখিতে হইবে। চট্টগ্রামে রেলপথকে আমাদের এই কাজেই লাগাইতে হইবে। এই রেল-লাইনের পূর্ব পার্শ্ব হইতে চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির অরণ্য বিস্তৃত। জাপানীরা যদি এই রেলপথকে কোনদিন কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে, যদি এই রেলপথে তাহারা বাঙলার যুদ্ধের রসদ ও সৈন্য পাঠাইতে চায়, তখন এই বিস্তৃত অরণ্য ও পর্বতশ্রেণী গরিলাদের অপূর্ব সুযোগ দিবে। বাঙলার বুকে যে-গোলা নিক্ষিপ্ত হইবে, বাঙলার অভ্যন্তরে যে-রণদস্যু অত্যাচারের বহ্নি জ্বালাইতে আসিবে, সেই গোলাকে, সেই রণদস্যুকে আমার বুকের উপর দিয়া লইয়া যাইতে দিব না—এই প্রতিজ্ঞাই চট্টলের গরিলাদল গ্রহণ করো। বাঙলার পূর্বদ্বারের প্রহরী! বাঙলার নরনারী আজ তোমাকে এই দায়িত্বই অর্পণ করিতেছে।

পরিশিষ্ট

১

গরিলা শিক্ষার কার্যকরী পদ্ধতি

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় গরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিবার সময় দেখিয়াছি, বহু স্থানে ছোট ছোট দল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা লইবার ও শিক্ষা দিবার সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকাতে দলগুলি ভালভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে না। সেইজন্য নিম্নে গরিলা যুদ্ধ শিক্ষা দিবার কার্যকরী পদ্ধতির একটা খসড়া দিতেছি। আবশ্যকবোধে স্থান ও সময়ের উপযোগী করিয়া ইহা অদল বদল করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কমাণ্ডার বাছাই

গরিলা, ভলান্টিয়ার বা রক্ষীবাহিনী গড়িবার কাজে সর্বপ্রথম আবশ্যক ঠিকমতো কমাণ্ডার বা ক্যাপ্টেন বা নেতা বাছাই করা। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হইবার জন্য যে সকল গুণাবলী থাকা আবশ্যক এক্ষেত্রেও কমাণ্ডারদের তাহাই থাকা চাই। অর্থাৎ তাহার সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে হইবে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে, যুদ্ধ-বিদ্যায় জ্ঞান থাকা চাই, বিপদের সম্মুখেও ঠাট্টা তামাসা করিবার (humour) ক্ষমতা

থাকা চাই, নিজের বিপদকে অবহেলা করিয়া অপরকে রক্ষা করিবার প্রেরণা থাকা চাই—ইত্যাদি। সর্বোপরি তাহাকে দরদী ও স্নেহপ্রবণ হইতে হইবে; অধীনস্থ সৈন্যের দুঃখ কষ্টকে মায়ের স্নেহে লাঘব করিবার প্রাণ থাকা চাই। ইহা ছাড়া গরিলা-নেতার অস্ত্র চালনার দক্ষতা এবং দেশের ভৌগলিক সংস্থান (Topography) নখদর্পণে থাকা আবশ্যক। সম্প্রতি বাঙলার কয়েকজন যুবক পাঞ্জাব হইতে গরিলা শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এইদিকে কাজে লাগাইবার সুবিধা হইবে। কিন্তু গরিলা-নেতাদের এখন হইতেই পরিশ্রম করিয়া স্থানীয় রাস্তাঘাটের সহিত একান্তভাবে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো একস্থানে ১০।২০ জন সভ্যকে একত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইলেই স্থানীয় দল বা সম্মিলিত দল অথবা জনরক্ষা কমিটিকে উপরে বর্ণিত গুণাবলী লক্ষ্য রাখিয়া গরিলা-কমাণ্ডার নিয়োগ করিতে হইবে।

আদেশ দিবার কায়দা

সাধারণ সৈন্যদলের গালভরা আদেশ (command) দিবার কায়দা দেখিয়া আমাদের ঘাবড়াইবার কিছু নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অমন গালভরা আদেশের কেরামতি দেখাইবার অবকাশ মিলে না। বিশেষ করিয়া গরিলাবাহিনীদের তো কথাই নাই। শত্রু আমার সম্মুখে; আমার আদেশগুলি তাহারা যেন

কোনো মতে শুনিতে না পায়; ইসারায় ইঙ্গিতে বা ফিস্ ফিস্ করিয়া আদেশ দিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ আদেশের কোনো বাঁধা-ধরা শব্দ নির্দিষ্ট থাকে না। আদেশগুলি সাধারণত এইরূপ হয়—"তোমরা বট গাছের আড়ালে ক্রমে ডান দিকে এগিয়ে চলো"—"ডানদিকে ছড়িয়ে পড়ে গুলী চালাও"—"ট্যাঙ্ক আসছে তৈরী হও"—"১নং দল এই মোড়ে দাঁড়াও, একটি শত্রুকেও ওপাশে যেতে দেবে না।"............এইরূপ আদেশগুলি দিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, এইগুলি যেন দীর্ঘ, প্যাঁচাল, বা অস্পষ্ট না হয়। সোজা এবং স্বল্প কথায় দৃঢ়তা সহকারে আদেশ দিতে হইবে। ইহার মধ্যে যেন 'যদি' ও 'কিন্তু'র বহর খুব বেশি না থাকে—যেমন, "যদি শত্রু বাম দিকে আসে এবং তখন যদি শত্রু অন্যমনস্ক থাকে, তাহা হইলে তুমি আক্রমণ করিতে পারো; কিন্তু যদি তুমি অসুবিধায় পড়ো এবং গুলীর সংখ্যা যদি কম থাকে তবে পালাইলেও পালাইতে পারো"—এইরূপ 'কিন্তু'- ও 'যদি'-পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত আদেশ কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দিতে নাই। ইহাতে সৈন্যরাও কাজে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সৈন্যদলকে যখন কোনো দায়িত্ব দিতে হয়, তখন কী উদ্দেশ্যে এই দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে, তাহার আভাষ এই দলকে জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য। (Subordinates must know the will of the Commander) ইহাতে ঘটনা পরিবর্তনের মাঝেও সে

দল মোট উদ্দেশ্য সফল করিবার কাজে সহায়তা করিতে পারে। কারণ, ইহা জানা না থাকিলে যে-ঘটনার সম্ভাবনায় সেই দলকে পাঠানো হইতেছে, কার্যস্থলে সেইরূপ ঘটনা কোনো কারণে না ঘটিলে, তাহারা কর্তব্য স্থির করিতে পারিবে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ দিবার নিয়ম হইলেও কোনো দলকে গড়িয়া তুলিবার সময় প্রথমে কয়েক দিন চীৎকার করিয়া আদেশ দিয়া শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা আছে। ডিমনষ্ট্রেশনের যেমন খানিকটা মূল্য আছে, তেমনি এইরূপ আদেশে একটু চলিতে-ফিরিতে জানিলে একসাথে ও একতালে দ্রুত আদেশ পালন করিবার অভ্যাস বা ধারণা জন্মে। শিক্ষার প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই নিয়ম পালন করিব। বাঙলা ভাষায় সামরিক শব্দ অতি কম। প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাইলেও, ইংরাজী বা হিন্দীর মতো জোরাল শব্দ মেলা দায়। তবুও বাঙলা ভাষায় আমরা আদেশ দেওয়া অভ্যাস করিব। যতই-না আমরা ইংরাজি বুঝি, বাঙলা ভাষার মতো তাহা দ্রুত বুঝিব না।

এই প্রত্যেক আদেশগুলিকে দুইভাগে উচ্চারণ করিতে হইবে। প্রথম-ভাগ স্বাভাবিক কথা বলিবার মতো শব্দ করিয়া (অবশ্য সকলেই যাহাতে শুনিতে পায়) ধীরে ও স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে। তাহার পর ১ অথবা ২ সেকেণ্ড থামিয়া আদেশের দ্বিতীয়-ভাগ দ্রুত ঝট্ করিয়া এবং জোরে উচ্চারণ

করিতে হইবে। এই দ্বিতীয়-ভাগ জোরে বলিবার সময় কথা সবটুকু স্পষ্ট না হইলেও ক্ষতি নাই। যেমন 'ডাইনে—ঘুর্'; কথাটা 'ঘুরো' কিন্তু ঘ-এর উপর জোর দিয়া ঘুর্ বলিতে হইবে। ইংরাজিতে যেমন about-turn আদেশ দিবার সময় turnকে সুধু tu বলিলেই চলে। আদেশকে ভাগ করিবার সময় এমন ভাবে ভাগ করিতে হইবে যাহাতে দ্বিতীয়-ভাগে মাত্র একটি মাত্রা থাকে। যেমন,—'মাটি কাম—ড়াও'। 'ড়াও'এর 'ড়া'কে জোরে উচ্চারণ করিয়া 'ও' প্রায় না উচ্চারণ করিবার মতোই বলিলে চলিবে।

শিক্ষার প্রথম অধ্যায়

নিম্নে যে আদেশগুলি দেওয়া হইল, তাহা পালন করিবার সময় শরীরের প্রতি অঙ্গ চালনার সুনির্দিষ্ট ও সূক্ষ্ম পন্থা আছে। সেই নির্দিষ্ট ও সূক্ষ্ম পন্থা অনুসরণ করিলে প্যারেড দেখিতেও যেমন সুন্দর হয় তেমনি সাধারণ সময়ে চলাফেরা করিতেও সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের যুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে হইবে। কাজেই সাধারণ চলাফেরার জন্য সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের আমাদের আবশ্যক নাই। আদেশগুলি যথাসম্ভব এই ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ

১। কমরেডস্

কমরেডস-এর পরিবর্তে অন্য যে-কোনো আহ্বানসূচক শব্দ

ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন ভলান্টিয়ার, বা রক্ষী, বা গরিলা, অথবা ভাইসব।

প্রথমে কোনো খোলা মাঠে ভলান্টিয়ারদিগকে লইয়া কমরেডস্ বলিয়া ডাক দিলেই তাহারা কমাণ্ডারের দিকে মুখ করিয়া, যে যেখানে আছে গোড়ালি একত্রিত করিয়া, পায়ের পাতা ৪৫ ডিগ্রি ফাঁক করিয়া, হাত দুইটি দুই পার্শ্বে আধা-মুঠা করিয়া ঝুলাইয়া, বীরের মতো বুক টান করিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে।

২। লাইন—বাঁধো ("ধো" জোরে উচ্চারিত হইবে)

এই আদেশ দেওয়া মাত্র সকলেই ছুটিয়া কমাণ্ডারের দিকে আসিবে। প্রথম যে আসিবে সে কমাণ্ডারের সামনে দুই হাত দূরে তাহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয় যে আসিবে সে প্রথম ব্যক্তির পিছনে দুই হাত দূরে দাঁড়াইবে। বাকি সকলেই দুই ভাগ হইয়া এই দুই ব্যক্তির বাঁ দিকে পর পর লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বেশি হইলে অনুরূপভাবে তিন লাইনেও দাঁড় করানো যাইতে পারে। লাইনে দাঁড়াইয়া ভলান্টিয়াররা কখনও পরস্পরে কথা বলিবে না। এই নিয়ম বিশেষ ভাবে পালন করিতে হইবে।

সাধারণত ভলান্টিয়াররা সকলে লাইনে দাঁড়াইবার সময় নিজস্ব স্থানে আরাম করিয়া দাঁড়াইতে পারে ; কিন্তু কমাণ্ডার যখন প্রতি আদেশের পূর্বে 'কমরেডস' বলিয়া ডাক দিবে তখন

সকলেই পূর্ববর্ণিত মতে গোড়ালি জোড়া, পায়ের পাতা ফাঁক ইত্যাদি করিয়া কমাণ্ডারের প্রতি মনোনিবেশ করিবে।

৩। বামে—ঘুরো (ঘুর্)।

৪। ডাইনে—ঘুরো।

৫। পিছন—ঘুরো।

এইগুলি করিবার সময় বাম গোড়ালি ও ডান পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া ঘোরা ইত্যাদি আইন মাফিক কায়দায় ঘুরিবার কোনো আবশ্যকতা নাই। সকলেই সহজ পন্থায় দ্রুত ঘুরিয়া যাইবে। পিছনে ঘুরিবার সময় সকলেই যেন ডানদিক দিয়া ঘুরে।

৬। আগে—চলো (লো,—চ, প্রায় উচ্চারণ হইবে না)

৭। পিছে—হটো (টো,—হ, প্রায় উচ্চারণ হইবে না)

কদম মিলাইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইবার কোনো আবশ্যকতা নাই। তবে প্রথমে যেন সকলেই বাম কদম আগে ফেলে। লাইনে মার্চ করিবার দরকার নাই। দূরে যাইতে হইলে লাইনকে বামে বা ডাইনে ঘুরাইয়া (ফাইলে) মার্চ করাইতে হইবে।

৮। জোরে—দৌড় (দৌ,—ড়, প্রায় উচ্চারণ হইবে না)

৯। ধীরে—চলো (লো)

দৌড়াইবার সময় হাত দুইখানি কনুইয়ের কাছে একটু ভাজ হইয়া (প্রায় এক সমকোণ) পার্শ্বে ঝুলিতে থাকিবে।

১০। বামে বা ডাইনে—চলো।

ফাইলে চলিবার সময় বাম বা ডান দিকে ঘুরিতে হইলে (wheel) এই আদেশ দিলে চলিবে।

১১। কমরেডস্—রুখো (খো)

থামিবার সময় এই আদেশ দিতে হইবে।

১২। মাটি কাম—ডাও।

সমস্ত চালনাটা এক সঙ্গে না করিয়া প্রথমে 'এক' 'দুই' 'তিন' আদেশ দিয়া অভ্যাস করানো যাইতে পারে—(এক) বাম কদম সামনে দিতে হইবে, (দুই) হাত দুইখানি নিচু হইয়া মাটিতে রাখিতে হইবে, (তিন) হাতের উপর ভর করিয়া পা দুইখানি পিছনে ছুঁড়িয়া উবু হইয়া শুইয়া পড়িতে হইবে। গোড়ালি কিম্বা কোনো অঙ্গ যেন উঁচু হইয়া না থাকে। ইহার পর এইগুলি দ্রুত এক সাথে এক আদেশে করিতে হইবে।

১৩। কমরেডস্—উঠো (ঠো)

একসাথে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইবে।

১৪। রাইফেল—রাখো (খো)

রাইফেল যখন আমাদের নাই তখন আমাদের বাঁশের লাঠি দিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। এই লাঠি সাধারণত ৪৪ ইঞ্চি হইবে (সাধারণ রাইফেলের দৈর্ঘ ৪৪ ইঞ্চি)। প্রথমে ডান পায়ের পাতার নিকটে ডান দিকে মাটিতে রাইফেলের বাট্ (কাঠ) রাখিয়া উপরে রাইফেলের মাথায় ডান

হাত দিয়া ধরিতে হইবে। 'ঝুলাও' বা 'কাঁধে' হইতে 'রাইফেল—রাখো' বলিলে এইভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

কমাণ্ডার 'কমরেডস' বলিয়া ডাক দিলেই ডান হাতখানি রাইফেলসহ ডান উরুর পার্শ্বে আসিবে।

১৫। রাইফেল—ঝুলাও (লাও)

'রাইফেল ঝুলাও' বলিলেই রাইফেলকে একটু উঁচুতে ছুঁড়িয়া উহার মাঝামাঝি স্থানে ডান হাতের মুঠাকে সরাইয়া রাইফেলকে মাটির সমান্তরালে ঝুলাইতে হইবে। আবার 'রাইফেল—রাখো' বলিলেই পূর্বের অবস্থায় আনিতে হইবে।

১৬। রাইফেল—কাঁধে ('ধে'-এর উপর জোর)

সাধারণত আমাদের 'ঝুলাও' অবস্থা রাখিলেই চলিবে এবং আমরা সহজ করিবার জন্য 'ঝুলাও' অবস্থা হইতে কাঁধে তুলিব। ইহা করিবার সময় সোজা ডান হাতের মুঠা রাইফেল সহ বাম কাঁধে লাগাইব এবং সেই সঙ্গে বাম হাতের কনুই সমকোণে ভাঙিয়া ও বাম হাত চিৎ করিয়া রাইফেলের নিম্ন অংশ তাহার উপর রাখিব। রাইফেল রাখিবার সময় ইহার গুলীর কেস (magazine) বাহির দিকে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত ডান দিকে ঝট্ করিয়া স্বস্থানে লইয়া আসিব।

রাইফেল হইতে গুলী করিবার সময় আমাদের অবশ্য করিয়া শুইয়া পড়িতে হইবে। তবে ভালো আড়াল পাইলে তাহার পিছনে নীচু হইয়া গুলী চালাইলেই হইবে। শুইয়া গুলী

করিবার সময় "মাটি কাম—ড়াও" আদেশ দিতে হইবে। তবে এখানে মাত্র বাম-হাত মাটিতে লাগাইয়া শুইতে হয়। কারণ ডানহাতে রাইফেল আছে। শুইবার সময় রাইফেল যাহাতে মাটিতে ধাক্কা না খায় তাহার জন্য আগে ডান কনুই মাটিতে লাগাইতে হইবে। রাইফেল ছুঁড়িবার উদ্দেশ্যে শুইবার সময় লক্ষ্য বরাবর না শুইয়া একটু ডানদিকে হেলিয়া শুইতে হয়। ইহাতে গুলী করিতে ও তাক্ করিতে সুবিধা হয়।

১৭। বোমা-—মারো ('রো'এর উপর জোর)

ইহার কায়দা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশদ লিখিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য। এক কথায় বাম পা আগে দিয়া শরীরের ওজন ডান পায়ে রাখিয়া বাম হাত উঁচু করিয়া ক্রিকেট বলের মতো ঝুঁকি মারিয়া ছুঁড়িয়াই শুইয়া পড়িতে হইবে। ইহাও এক, দুই, তিন করিয়া করা যাইতে পারে।

১৮। বুকে—হাঁটো (টো)

শায়িত অবস্থায় শরীরের কোনো অংশ উঁচু না করিয়া হাত এবং হাঁটুর সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে এক আশ্রয় বা এক গর্ত হইতে অন্য আশ্রয় বা গর্তে যাইবার সময় এমনি করিয়া কচ্ছপের মতো অগ্রসর হইতে হয়।

এই সকল আদেশগুলি শিখাইবার সময় কমাণ্ডার প্রথমে দুইবার কি তিনবার বুঝাইয়া বলিবে। তাহার পর সম্মুখে তাহাকে নিজে করিয়া সকলকে দেখাইতে হইবে। ইহার পর

প্রত্যেক চালনাকে ('মাটি-কামড়াও' আদেশে যেমন বলা হইয়াছে) প্রথমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভলান্টিয়ারদের অভ্যাস করানো দরকার। প্রতি চালনা শিক্ষা দিবার কালে কমাণ্ডারের যেন লক্ষ্য থাকে, প্রত্যেকটি ভলান্টিয়ার তাহার আদেশ মতো কাজ করিতেছে। কেহ ভুল করিলে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবার যেন ইচ্ছা না থাকে। বার বার আদেশ দিয়া তাহাকে দিয়া ভুল শুধরাইয়া লইতে হইবে।

শিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায়

উপরের ১৮ দফার সহিত আরও দুই একটি সুবিধা মতো যোগ করা যাইতে পারে। মোট কথা উপরের ফিরিস্তি ধরিয়া ১০।১২ দিন প্যারেড করিবার পর দেখা যাইবে যে, বাহিনীটি দানা বাঁধিয়াছে, অর্থাৎ ইচ্ছামতো ইহাকে সুন্দরভাবে না হইলেও কাজের উপযোগী ভাবে চলাফেরা করানো সহজ হইয়া আসিয়াছে। ইহার পর গরিলাবাহিনীর আসল শিক্ষা আসিবে।

১। গরিলাদলের পক্ষে হাত-বোমাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অস্ত্র। হাত-বোমা চালনার কাজে নিরিখ করাই কষ্টসাধ্য। বহু পরিশ্রম করিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের অস্ত্র স্বল্প, কাজেই একটি হাত-বোমাও যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। মাঠের মাঝে ছোট

গর্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে ২৫ গজ হইতে ৫০।৬০ গজ পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের ইট (১—৬ পোয়া) লইয়া স্থির বস্তুকে আঘাত করা শেখা যায়। তাহার পর চলন্ত বস্তুকে দূর হইতে আঘাত করার শিক্ষা লওয়া দরকার। সাইকেল বা গরুর গাড়ী বা নৌকাকে চলন্ত অবস্থায় মারা চাই ; এবং পরে কোনো লরী চালকের সহিত ব্যবস্থা করিয়া আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তুকে মারা অভ্যাস করা যায়। গর্তের ভিতর হইতে, বা গাছের আড়াল হইতে, বা বনের অভ্যন্তর হইতে হাত-বোমা মারা অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। দিনের পর দিন এই হাত-বোমা ছুঁড়িতে শিখিতে হইবে !

২। ক্রস-ফায়ার—দলটিকে দুই-তিনটি ছোট দলে ভাগ করিয়া ক্রস-ফায়ার বা কোণাকুণি গুলী করিয়া কীভাবে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। উচু-নীচু মাঠে, বনে, নদীর তীরে, গ্রামের বাড়ীগুলির মাঝে একে একে এই চালনা অভ্যাস করা দরকার। যুদ্ধের মাঝে গুলী করিবার ফাঁকে একটি আড়াল হইতে সম্মুখের আড়ালে কী করিয়া বুকে হাটিয়া বা নীচু হইয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে হয় তাহা শিখিতে হইবে।

৩। পরিকল্পনা বা প্ল্যান করিয়া আক্রমণ করিবার শিক্ষা—

মনে থাকে যেন গরিলাদের সর্ব সময়ে ধূর্ত ও তৎপর-

শীল হইতে হইবে। (ক) একটি বাড়ীতে জাপানীরা আশ্রয় লইয়াছে, তখন তাহার প্রহরীদের ফাঁকি দিয়া কী করিয়া আক্রমণ করা যায়, তাহা প্রত্যেক গরিলা-যোদ্ধাকে মাথা খাটাইয়া বার-বার নূতন কায়দায় আক্রমণ করিতে শিখিতে হইবে। (খ) কোনো লরী-চালকের সহিত ব্যবস্থা করিয়া কীভাবে চলন্ত লরীকে হঠাৎ থামাইতে বাধ্য করাইয়া আক্রমণ করা যায়, তাহা অভ্যাস করিতে হইবে। (গ) গরিলাদের দুইটি দলে ভাগ করিয়া কিছু মাটির ঢেলা সাথে দিয়া কোনো গ্রাম বা বনের ভিতর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে অভ্যস্ত করা হউক, ইহাতে যদি কেহ অল্প-বিস্তর আহত হয়, তাহাতে কিছু আসে-যাইবে না। (ঘ) গরিলাদের দুইটি দলে ভাগ করিয়া একটিকে রাত্রে বা দিনে কোনো রাস্তায় চলিতে আদেশ দেওয়া হউক এবং সেই সময়ে অন্য দিক হইতে দ্বিতীয় দল অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় দলের দায়িত্ব রহিবে ১নং দলের সহিত দেখা হইবার প্রাক্কালেই ঝটিতে রাস্তার দুইপার্শ্বে লুকাইয়া পড়া। ২নং দল তাহার সম্মুখে ছদ্মবেশে একজন টহলদারী সৈন্যকে চলিবার ব্যবস্থা করিবে। এই টহলদারী সৈন্য ২নং দলকে ইঙ্গিতে অগ্রবর্তী ১নং দলের কথা জানাইবে। (ঙ) ১নং ও ২নং দলকে কোনো রাস্তার উপর ৩০০।৫০০ গজ দূরে দূরে রাখা হউক। ১নং দল পালাইতে থাকিবে এবং ২নং দল তাহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকিবে। কমাণ্ডার দেখিবে ১নং

দল কী করিয়া অন্য দলকে ফাঁকি দিয়া পথ বা বিপথ দিয়া পালাইতে পারে। পালাইবার সময় বা অনুসরণ করিবার সময় যে-দল যত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিবে ততই তাহার কৃতিত্ব; তবে পালানই আসল কথা, ইহা ঠিক থাকে যেন। (চ) গরিলাদলকে মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়া, হঠাৎ উড়োজাহাজের আবির্ভাবে ছড়াইয়া পড়া বা লুকানো শিখাইতে হইবে। (ছ) প্রত্যেক গরিলাকে ছদ্মবেশে অনুসন্ধান লইতে শেখা চাই। একদিন হয়ত তুইটি গরিলা-যোদ্ধাকে সুবিধামতো বিভিন্ন ছদ্মবেশে এক গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহাদের কাজ হইবে, কাহাকেও সন্দেহ করিতে না দিয়া গ্রামের কত লোক জাপানীদের সপক্ষে আছে, বা কোন বাড়ীতে বেশি ধানের গোলা আছে তাহা জানিয়া আসা। এমনিভাবে ছদ্মবেশে নানা বিষয়ের খবর আনিতে শিখিতে হইবে। (জ) এই সকল ছাড়াও আমাদের অনেক রাজনৈতিক কাজ করিতে জানা চাই। বিশেষ করিয়া জাপ-বিরোধী বক্তৃতা দিতে, বা জাপ-বিরোধী নাটক অভিনয় করিতে শিখিতে হইবে। ছোটখাট অনেক জাপ-বিরোধী নাটক বাহির হইয়াছে (যাত্রা ধরণের)। সেইগুলি এখন হইতে অভিনয় করিতে শিখিতে হইবে।

উপরে (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত যে কার্যক্রম দেওয়া হইল তাহা পালন করিবার সময় কখনও কমাণ্ডার জোরে বা চীৎকার

করিয়া আদেশ দিবে না। এখন সর্বসময়ে তাহারা ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বা ইসারায় সমস্ত আদেশ দিবে। বলা বাহুল্য, এই সকল আদেশ দিবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বাক্য স্থির করিবার আবশ্যক নাই।

বাঙলার বুকে গরিলাদলের দানা বাঁধিয়া উঠিবার উপায় বা পন্থাস্বরূপ কয়েকটিমাত্র দফা দিলাম। গরিলা-যোদ্ধা আপন তৎপরতায় পন্থাগুলিকে অধিকতর সুষ্ঠু করিয়া লইতে পারিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

(২)

ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ও গরিলার কর্তব্য

বাঙলার মাটিতে অল্পবিস্তর ট্যাঙ্কের যুদ্ধ দেখা দিলেও বড় আকারে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ এখানে সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের নরম মাটিতে ট্যাঙ্ক প্রায় অচল হইয়া পড়িবে। তবুও গরিলা-যোদ্ধাদের ট্যাঙ্ক প্রতিরোধের পন্থা জানা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই এই পরিশিষ্টের যোজনা।

'যুগান্তর' পত্রিকায় গরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা কালে জনৈক পত্রলেখক গরিলা যুদ্ধ ও ট্যাঙ্ক প্রতিরোধ বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই ধরণের প্রশ্নগুলি আলোচনা করিতে আমরা বিশেষ ইচ্ছুক। আজ হউক কাল হউক, যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল বলিয়া। সেইজন্য এই ধরণের সমস্যাগুলির যতই আলোচনা হয় ততই ভালো—বিশেষ করিয়া গরিলাবাহিনীর প্রশ্নগুলি। কেননা, নিরস্ত্র ভারতবাসীর যদি কখনও বিদেশী শক্তির সহিত লড়িতে হয়, তখন তাহার একটি প্রধান সহায় হইবে এই গরিলাবাহিনী। ইহাকেই মনের কোণে লক্ষ্য রাখিয়া এক সময়ে "শিবাজীর আমল হইতে ষ্ট্যালিনের আমল পর্যন্ত গরিলা যুদ্ধ"

(যুগান্তর ১৯-৮-৪৮) নামক প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। গরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশল প্রথমে ভারতেই সৃষ্ট হয়। তখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। বর্তমানে যেমন হিন্দু-মুসলমানেরা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহা হয় নাই। কেবলমাত্র তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল। মোগল সেনানী তখনও বিদেশী শক্তি বলিয়া পবিগণিত। এই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের সর্বজনপ্রিয় যোদ্ধা ও নেতা শিবাজীর অধীনে বর্গী সৈন্যেরা ভারতের মাটিতে গরিলা যুদ্ধেব পত্তন করে। ভারতে যে-নীতির প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে আবার সেই নীতির শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ বর্তমান যন্ত্র-যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইহার কার্যকারিতা দেখাইবার দায়িত্ব আসিবে। তাই আমাদের গরিলা-যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইবার আবশ্যকতা আছে।

প্রাপ্ত পত্রখানি এইরূপ :—

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি ; কারণ, গরিলাবাহিনীর অস্তিত্ব তথা কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মাসখানেক পূর্বে 'Statesman' পত্রিকাও এ বিষয়ে সন্দেহাত্মক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আশা করি মহাশয়, প্রশ্ন কয়েকটির সদুত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ

১। গরিলাবাহিনীর বর্তমান যুদ্ধে সংগঠক কে এবং কাহার নির্দেশক্রমে উহারা পরিচালিত হয় ?

২। খবরের কাগজে আমরা পড়িয়া থাকি যে, রুশবাহিনী কোনো ঘাঁটি পরিত্যাগের পূর্বে Stalin-এর উদ্ভাবিত Scorched earth policy সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উক্ত বাহিনী কোথায় থাকে, কী খায় এবং অস্ত্রাদির সরবরাহই-বা কিরূপে কোথা হইতে পাইয়া থাকে।

৩। কোনো বিচক্ষণ সেনাপতিই শত্রুকে পশ্চাতে রাখিয়া কখনও সম্মুখভাগে অগ্রসর হন না। সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ রক্ষার জন্য Rearguard সর্বদাই সজাগ থাকে। সুতরাং জার্মাণ বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে গরিলাদের অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবপর ?

৪। সংখ্যাল্পতা এবং উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব বশত গরিলাবাহিনী কখনও সম্মুখ-যুদ্ধ করে না। শত্রুকে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত রাখা এবং সাধ্যমতো তাহাদের ক্ষতি করাই হইতেছে এই বাহিনীর কাজ। আক্রান্ত হইলেই ইহারা পলায়ন করে এবং সুবিধামতো স্থানে গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। কিন্তু এই এরোপ্লেনের যুগে এই প্রকারে অতর্কিত আক্রমণ, পলায়ন, যথেচ্ছ আত্মগোপন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উপরে উঠিলে বহুদূর দেখা যায়, সেখান হইতে মেসিনগান দিয়া অথবা বোমা ফেলিয়া এই অরক্ষিত মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিতে রণ-নিপুণ জার্মাণ সৈন্যের কতক্ষণ লাগে ?

৫। অস্ত্রের অভাব হইলে তাহারা নাকি পেট্রোলপূর্ণ বোতল শত্রুর ট্যাঙ্ক, লরী ইত্যাদির উপর ফেলিয়া হাজার হাজার ট্যাঙ্ক লরী ইত্যাদি পোড়াইয়া দেয়। ট্যাঙ্ক সুদৃঢ়-ভাবে গঠিত এবং বর্মাবৃত। যুদ্ধ-ফেরত সৈনিকদিগের নিকটে শুনিয়াছি যে, শক্তিশালী হাত-বোমা বা Hand Grenade লাগিলেও ট্যাঙ্কের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। সংবাদ-পত্রেও পড়িয়াছি যে, Tank মারিবার জন্য বিশিষ্ট প্রকারের কামান ও বোমা নির্মিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পেট্রোল-পূর্ণ বোতল মারিয়া কী প্রকারে উহা পোড়াইয়া দেওয়া যায় বুঝিলাম না। কল্পনার বলে যদি গরিলাসৈন্যের পেট্রোলপূর্ণ বোতলকে ট্যাঙ্কমারা কামান বা বোমা অপেক্ষাও বহুগুণ শক্তিশালী ধরিয়া লই, তবুও বোতল ছুঁড়িয়া মারিতে হইলে ট্যাঙ্কের যতখানি কাছে আসিতে হয়, সদাসতর্ক দুর্ধর্ষ জার্মাণ সেনাবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিয়া অথবা শ্রেণীবদ্ধভাবে ট্যাঙ্ক বা লরীর চলন্ত অবস্থার সময়ে, অসহায় গরিলাবাহিনী উহার ততখানি কাছে ঘেঁষিতে পারে কি?

৬। জার্মাণবাহিনীর পশ্চাতে থাকিয়া এত বোতল গরিলারা কোথা হইতে পায়—বোতলে ভরিবার পেট্রোলই বা কে উহাদিগকে যোগাইয়া থাকে?

৭। ইয়োরোপ-বিজয়ী জার্মাণ সৈন্যের সেনাপতির শিবির আক্রমণ করিল ১৮ জন নারী—তাহা দেখিয়া শিবির

রক্ষী সৈন্য বা পাহারাওয়ালা বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল—মেয়েরা নির্বিবাদে শিবিরে দিল আগুন ধরাইয়া—শিবিরের মধ্যে তিনজন জার্মাণ অফিসার ছিলেন—এই বেড়া আগুনে গোয়ালে বাঁধা গরুর মতন তাঁহাদের দুইজন পুড়িয়া মরিলেন এবং তৃতীয় জনকে "একটি ১৬ বৎসর বয়স্কা গোয়ালিনী মেয়ে কুড়ুল দিয়া কোপাইয়া মারিল।" এ গল্পটি মিত্র মহাশয় নিজে অকপটভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন, নতুবা সোভিয়েট রুশিয়ার নারী-শৌর্যের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেন না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি সকলের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হইবে? সকলেরই কি চিত্তের প্রসার একরকম? রুশিয়ার মা লক্ষ্মীরা যদি এই প্রকারের পরাক্রম সদাসর্বদা জার্মাণ সেনাপতিদের উপর প্রকাশ করিতে থাকেন, তবে নাজীরা আর কয়দিন রুশিয়ায় দাঁড়াইতে পারিবে? হাজার হইলেও তাঁহারা মহাশক্তির জাত!

নিঃ—

শ্রীবীরেশ্বর বাগচি বি, এ,

গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

এই সাতটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রায় সবই এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থলে মিলিতে পারে। তবুও এই ধরণের প্রশ্নকারী ও পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য ভিন্নভাবে প্রশ্ন কয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

ট্যাঙ্কযুদ্ধ ও গরিলার কর্তব্য

১। প্রথমে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, গরিলা যুদ্ধ করিতে গেলে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইতেছে, বিস্তৃত প্রান্তর। আর সে প্রান্তর যদি দুর্গম হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। সঙ্কীর্ণ পথে এই যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য লক্ষ্য করিয়া থাকিলে দেখিবেন রুশ-জার্মাণ যুদ্ধে হোয়াইট রাশিয়া ও ইউক্রেণ অঞ্চলেই অধিক গরিলা যুদ্ধের কথা শুনি, কিন্তু লেনিন-গ্রাডের সন্নিকটে বিশেষ কোনো গরিলাবাহিনীর কাহিনী শুনা যায় না। কারণ ইহাদের "tactics should be tip and run ; not pushes but strokes." ইহাদের ছোঁ মারিবার মতো কোনো স্থানে তীব্র বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এলোপাথাড়ি আঘাত করিয়া আবার তীব্র বেগে উধাও হইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে চাই বিস্তীর্ণ ভূমি। অল্প পরিসর স্থানে মারিয়া পালাইবার বা পালাইয়া মারিবার অবকাশ থাকে না। সাধারণ সৈন্যদলের মতো যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহাদের কোনো নেতা বা অধিনায়ক লাগে না। এখানে ছোট ছোট দলগুলির বা ব্যক্তিগত যোদ্ধার তৎপরতাই বড় কথা ও একমাত্র কথা। কাহারও আদেশের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। সুযোগ পাইলে মারো, বেগতিক দেখিলে পালাও,—ইহাই এদের কৌশল। কিন্তু, ইহাদের যদি কোনো নেতার আবশ্যক না থাকে, তবে আমরা শিবাজী বা লরেন্সের মতো নেতার কথা শুনি কেন? অবশ্য যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহারা কোনও

নেতার মুখ চাহিয়া থাকে না; কিন্তু এই যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে সংগঠনের আবশ্যকতা আছে, অতএব নেতারও প্রয়োজন আছে। এই ব্যক্তিগত তৎপরতা জাগাইতে স্থানীয় জনগণকে এমন এক বৃহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে যে, একক যুদ্ধ করিয়া নিবিড় জঙ্গলে, দুস্তর মরুভূমিতে, দুর্গম গিরিকান্তারে, সকলের অলক্ষ্যে ও অজানিতে সে যখন মৃত্যুকে বরণ করিবে, তখন যেন তাহার বক্ষ মূহূর্তের জন্যও কাঁপিয়া না উঠে। এই আদর্শের প্রেরণা জাগাইবার জন্য নেতার আবশ্যকতা আছে। মারাঠার মাওয়ালী ও আরবের বেদুইনের বুকে স্বাধীনতার অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে শিবাজী না হইলে হইত না, লরেন্স না হইলে হইত না। কিন্তু বর্তমানে চীনের গিরিগহ্বরে ও ইউক্রেণের ধু-ধু প্রান্তরে এই নেতার স্থান সাম্যবাদীদল গ্রহণ করিয়াছে। সাম্যবাদীদল সে দেশের জনগণকে আজ সমাজতন্ত্রবাদের এক মহত্তর আদর্শে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা জানিয়াছে, তাহাদের মুক্তি এই পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথে আসিবে না। তাই তাহারা আজ মরিয়া। একক পারিলে একক মারিবে, দশে পারিলে দশে মারিবে। সোভিয়েটবাসী প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সাম্যবাদীদল গত বিশ বৎসর ধরিয়া এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। তাই ষ্ট্যালিনের আহ্বানে গরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হইতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই।

ট্যাঙ্কযুদ্ধ ও গরিলার কর্তব্য

ইহা ভিন্ন আর একটি প্রশ্ন মনে জাগিতে পারে। সংগ্রামের মধ্যেও যুদ্ধ কৌশল নিয়া কি ইহাদের নেতার নিকট হইতে কোনও নির্দেশের প্রয়োজন নাই ? কার্যত দেখা গিয়াছে, কোনো প্রয়োজনই নাই। ইহাদের মাত্র একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য জানাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাই পালন করা ইহাদের একমাত্র কাজ। "It should not seek for his (enemy's) main strength or his weakness but for his materials"—Lawrence. অন্য কোনও লক্ষ্য নয়, একমাত্র শত্রুশক্তির রসদ ও আহারকে ধ্বংস করাই ইহাদের কাজ। কথা উঠিতে পারে, শত্রুরা তো শক্ত পাহারায় রসদ ও আহার চালনার ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যদি নাৎসীকে সুদূর বার্লিন হইতে রষ্টভ পর্যন্ত রসদ ও আহার আগল দিয়া বেড়াইতে হয় তবে তাহার সৈন্যের অর্ধাংশকে সম্মুখ মহড়া হইতে পিছনে আনিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে কোনো নির্দিষ্ট মহড়ায় তীব্র আক্রমণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ইহাই তো গরিলাবাহিনীর সুযোগ।

২। গরিলাবাহিনীর এক-একটি দলে কখনও লক্ষ বা হাজার বা এক শত, দুই শত যোদ্ধা থাকে না। ১০জন বা ১৫জন লইয়া এক-একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হয়। পরস্পরের সঙ্গে ইহাদের যোগাযোগ না থাকিলেই চলিবে না এমন নয়। ইহাদের অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। ভাঙা বাড়ীতে,

গাছের তলায়, মাটির অভ্যন্তরে ইহাদের আশ্রয়। ষ্টালিনের নীতি (Scorched Earth Policy) অনুযায়ী দেশ ছারখার করিলে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যদলের হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয় মেলা ভার ; কিন্তু দুর্দান্ত গরিলাদলের পক্ষে ভাঙা বাড়ী ও মাটির গর্ত মিলাইতে কষ্ট হয় না। তাহারা ভাড়াটিয়া সৈন্য নহে, তাহারা আদর্শ পূজারী সৈনিক।

সমস্যা হইতেছে আহারের। একটি ঘটনার কথা বলিলেই ইহার সমাধানের পথ মিলিবে। লরেন্স তাঁহার বেদুইনবাহিনী-দের গরিলা যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। তুর্কীরা মদিনা দখল করিয়াছে। প্যালেষ্টাইন হইতে মদিনার পথ সঙ্কীর্ণ। একটি রেল-পথই ইহাদের যোগাযোগ রাখিয়াছে। কথা উঠিল, এই রেলপথ ধ্বংস করিয়া মদিনায় অবস্থিত তুর্কী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। ইহা করা অতি সহজ ছিল। কিন্তু লরেন্স নিষেধ করিলেন। বলিলেন, মদিনার তুর্কী বাহিনীকে মূল শত্রু-বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের লাভ নাই ; বরং ঐ বাহিনী থাকিলে তুর্কীরা উহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আহার ও রসদ পাঠাইতে থাকিবে। ইহাই সুযোগ। বেদুইনদেরও তো খাইয়া বাঁচিতে হইবে। অতএব রেললাইন ধ্বংস করিও না। গাড়ী বোঝাই আহার লুঠ করিতে থাকো। এই ভাবেই গরিলা যোদ্ধাদের আহার মেলে। শত্রুর আহার লুঠ করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে।

৩। এবং ৪। গরিলাবাহিনী সাধারণত যোদ্ধার পোষাক পরিহিত থাকে না। সাধারণ হইতে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা ভার। শত্রুসৈন্য যখন ১৫০০ মাইল রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতে থাকে তখন আশে-পাশে বহু গ্রাম এড়াইয়া চলিতে হয়। হঠাৎ যেখানে খণ্ডযুদ্ধ দেখা দেয়, যেমন স্মলেস্কের সম্মুখে বা কিয়েভের নিকটবর্তী স্থানে, সেখানে অবশ্য অধিবাসীদের থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অনাক্রান্ত স্থানগুলিতে বহু অধিবাসী রহিয়া যায়। যুদ্ধটা "জগৎজাল" অর্থাৎ দীর্ঘ ও বিস্তৃত জাল দিয়া পুকুরের মাছ ধরা নহে, ইহা কোঁচের আঘাতে দলবদ্ধ মাছ শিকারের মতো। শত্রুদলের যেখানে দলবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর বা যেখানে তাহারা ঘাঁটি বাঁধিয়া আছে, সেই স্থান-গুলিতে নানাভাবে ব্যূহের সৃষ্টি করিয়া আঘাত করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ফলে বহু স্থানে শত্রুদলের আবির্ভাবই ঘটে না। ধরুন, ঢাকায় আমাদের মস্ত ঘাঁটি। সাধারণত তখন শত্রুপক্ষ একদল জমায়েৎ সৈন্য রেলে করিয়া গোয়ালন্দে পৌঁছাইয়া পদ্মা পার হইয়া সোজা ঢাকার অভিমুখে অগ্রসর হইবে; এবং আরেকদল হয়ত ট্রেণে করিয়া সিরাজগঞ্জ পৌঁছাইয়া সোজা দক্ষিণ-পূর্বগামী হইয়া ঢাকার দিকে যাইবে। ফলে, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা ও গোয়ালন্দ এই ত্রিকোণের মধ্যবর্তী গ্রামগুলি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠে না বা উঠিতে বিলম্ব হয়। অবশ্য শত্রুপক্ষের সেনাপতি কিছু টহলদার পাঠাইয়া খবর

লইতে চেষ্টা করিবেন যে, এই মধ্যবর্তী স্থলে কোনোস্থানে বা কোনো পথে অপরপক্ষ তাহাদের সৈন্য অগ্রসর করাইতেছে কি না। ঢাকার ৩০ মাইল পশ্চিমে যখন তীব্র যুদ্ধ জমিয়া উঠিবে, তখন সে অঞ্চলে আর অধিবাসীদের থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু ঐ ত্রিকোণ ভূমিতে জনগণের সঙ্গে সঙ্গে গরিলাবাহিনী লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। পাঁচজন বা দশজনের সাধারণ পোষাক-পরা দলগুলিকে গ্রামের অভ্যন্তরে এরোপ্লেন সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে নিশ্চিহ্ন করা তো পরের কথা, খুঁজিয়া পাওয়াই কষ্ট।

৫। এবং ৬। ট্যাঙ্কের ছবি সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা আর কিছু নহে, মধ্যে একটি ছোট ঘর, চারিপাশ দৃঢ় ইস্পাত-বর্মে আবৃত। দৃঢ় চেনের সাহায্যে মাটি কামড়াইয়া অগ্রসর হয়। ভারী হইলেও ইহাদের গতি-ক্ষমতা বর্তমানে ঘণ্টায় ৩০ মাইল। ছোটখাট গর্ত ডিঙাইয়া পার হইবার জন্য স্প্রিঙের ব্যবস্থা আছে। ইস্পাত-বর্মের মধ্য দিয়া দীর্ঘ মেসিন-গানের নল বসানো। ইহা হইতে মিনিটে ২০০।৩০০ গুলী অনর্গল উদ্গীরণ করা যায়। গতবার যখন ১৯১৭ সালে ইহার প্রথম আবির্ভাব হইল, (বৃটিশ অধিবাসী Swinton ইহার আবিষ্কারক) তখন জার্মাণীরা ইহাকে আর রুখিতে পারিতেছিল না। তখনও এন্টি-ট্যাঙ্ক-কামান বাহির হয় নাই। অন্য উপায় না দেখিয়া লুডেন ডর্ফ এক অভিনব আদেশ দিলেন। বলিলেন,

যখনই কোনো ট্যাঙ্ককে আসিতে দেখিবে, অমনি ২৫।২৬ জন সৈন্য তাহার দিকে ছুটিয়া যাইবে। ইহার কাছে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে হয়ত ২৫ জনের ২০ জন মারা পড়িবে। ক্ষতি নাই, অবশিষ্ট পাঁচজনকে তখন ট্যাঙ্কে চড়াও করিয়া উহাকে ভাঙিয়া বা পোড়াইয়া দিতে হইবে। এই আদেশেই মিত্র-শক্তির ট্যাঙ্কের গতি তখন বেশ খানিকটা থামিয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, ট্যাঙ্ক হইতে দূরেই বিপদ, নিকটে পৌঁছাইতে পারিলে বিপদ কমিয়া আসে। কারণ, শত্রু উহার উপর একবার চড়াও করিতে পারিলে, ভিতর হইতে মেসিনগানের নল ঘুরাইয়া আরোহিত শত্রুকে লক্ষ্য করা অসুবিধা।

ট্যাঙ্কের সর্বাপেক্ষা দুর্বল স্থান উহার চাকা, চেন ও চাকার নিকটবর্তী কলকব্জা। সেই জন্য ঐ চাকার কলকব্জাকে আঘাত করিতে পারিলে উহা অকেজো হইয়া পড়ে। স্পেনের রণাঙ্গনে বহু সময় বহু গণতান্ত্রিক সৈন্যদল ট্যাঙ্কের চলতি চাকার অভ্যন্তরে বড় লৌহদণ্ড বা কম্বলের ওভারকোট ঢুকাইয়া দিয়া উহাকে অচল করিয়া মারিয়াছে। নিকটে যাইয়া ঐ চাকার অভ্যন্তরে যদি একবার হাত-বোমা ফেলা যায় বা জ্বলন্ত পেট্রোল দেওয়া যায়, তবেই উহা শেষ। দূর হইতে অবশ্য বড় বোমা বা গোলা লাগাইয়া উহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করা সম্ভব নহে। কিন্তু নিকটে যাওয়াই সমস্যা। স্পেনের

ইতিহাসে দেখিয়াছি, যখন গণতান্ত্রিক সৈন্যদলের কোনও ক্ষুদ্র অংশ জানিতে পারিয়াছে যে, কোন এক পথে শত্রু-ট্যাঙ্ক অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তখনই তাহারা পথের পার্শ্বে গর্ত খুঁড়িয়া গাছপালা ঢাকা দিয়া বসিয়া গিয়াছে বা কোনো রাস্তার মোড়ে যেখানে ট্যাঙ্কের গতি বেশ খানিকটা কমাইতে হইবে তেমন একটি স্থানের সন্নিকটে কোনো গৃহের অভ্যন্তরে দরজার সম্মুখে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শত্রুদলের ট্যাঙ্ক আসিলেই ছুটিয়া উহার চাকার অভ্যন্তরে হাত-বোমা নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে। এই দুর্ধর্ষতার জন্য পশ্চাতের ট্যাঙ্কবাহিনীর হাতে তাহাদের প্রাণ দিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে প্রাণের বিনিময়ে শত্রুর একখানি ট্যাঙ্ককে ধ্বংস করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। কুর্মের দৃঢ় বর্ম থাকিলে কী হইবে, তাহার দুর্বল স্থান রহিয়া গিয়াছে ; তেমনি ইস্পাতমণ্ডিত যানকে গতি দিতে গিয়া উহার তলদেশে সামান্য আঘাত-কাতর যন্ত্র রাখিতে হইয়াছে। ইহাই গরিলাবাহিনীর সুযোগ। কিন্তু এই হাত-বোমা ও গোলাই বা কোথা হইতে মিলিবে ? আমরা ধরিয়া লইতে পারি, যেখানে পশ্চাৎ হইতে স্বপক্ষের সাথে যোগাযোগ আছে সেখানে ইহার অভাব হইবার কারণ নাই। কিন্তু যেখানে গরিলাবাহিনীগুলি শত্রু মহড়ার পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে, সেখানে তাহাদিগকে আহার সংগ্রহের ন্যায় শত্রুর কবল হইতে হাত-বোমা, রাইফেল বা পেট্রোল জোগাড় করিতে হইবে।

ট্যাঙ্কযুদ্ধ ও গরিলার কর্তব্য

৭। রাশিয়ার "মা লক্ষ্মীদের" লইয়া শ্লেষ করিয়া আমাদের বাঙালীদের অব্যাহতি নাই। কারণ, ফরাসীর, আয়র্লণ্ডের এবং বাঙলার "মা লক্ষ্মীরা" এযাবৎ অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। আদর্শই মানুষকে মরিয়া করিয়া তোলে। কোনো বিপদ, কোনো বাধাকে তখন দুরতিক্রমণীয় বলিয়া মনে হয় না। ইহার উপর যখন বর্বর নাৎসীরা তাহাদের গৃহ জ্বালাইয়া দেয়, তাহাদের স্বামী, ভ্রাতা, সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে কসুর করে না, তাহাদের সম্মানকে অমর্যাদা করিতে এতটুকুও দ্বিধা করে না, তখন-যে সে দেশের নারীরা প্রাণের তোয়াক্কা না রাখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। জীবন-মরণ রণাঙ্গন হইতে চার হাজার মাইল দূরে শাবকের মতো পাখীর ডানার আশ্রয়ে বসিয়া সত্যই আমাদের অনুমান করিতে কষ্ট হয়, মানুষের জীবন লইয়া কী নিদারুণ নির্মম ছিনিমিনি খেলা আজ সেখানে চলিয়াছে'—নারী হোক আর পুরুষ হোক, সবল হোক আর দুর্বল হোক, প্রত্যেকের জীবনে—ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগত-ভাবে কত আশ্চর্যতর বিপর্যয় যে ঘটিতেছে তাহার সত্যই পরিমাপ হয় না।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্তী (৩।১, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা) ৩-১১-৪১ তারিখের যুগান্তরে পূর্বোক্ত পত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন : বাগচি মহাশয় কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাহার অপর অংশগুলির সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রশ্নের যে-উত্তর মিত্র মহাশয় দিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতেছি।

গত জুন মাসের (১৯৪১) "Popular Science" নামক আমেরিকার এক পত্রিকায় এই প্রকার পেট্রলপূর্ণ বোতলের কথার উল্লেখ আছে। উহাতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

HOME MADE TANK BOMBS.

There is more than one way to stop a tank, and one of the simplest is the "Molotov cock tail" which has been used successfully on European battle fields. Lt. Col. William F. Heavey, U. S. Army Corps of Engineers, writing in a recent issue of the "Infantry Journal" states that an effective bomb of this type can be made from an ordinary quart bottle. This is filled with a mixture, half gasolene and half oil or creosote, as gasolene alone burns out too quickly. A good sized piece of cotton waste is taped to the bottom of the bottle, and an engineer's fuse lighter to the side. In use gasolene is poured on the waste the lighter is pulled and the bomb is thrown. Because these devices can be dangerous to throwers as well as to targets, Col. Heavey suggests that troops should practice for a while with water filled bombs before using an explosive mixture. A

direct hit will usually create enough heat to force crew to abandon the tank in a hurry.

Hand grenade-এর দ্বারা ট্যাঙ্কের কোনো কোনো অংশ ভাঙা যাইতে পারে; কিন্তু মলোটভ-কক্‌টেইলের আগুন একেবারে একটি ট্যাঙ্কের সর্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সামান্য ফাঁক দিয়া ভিতরেও মাঝে মাঝে ঢুকিয়া পড়ে। এই বোতলের সুবিধা হইতেছে এই যে, ইহা যে-কেহ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু Hand grenade-এর উপকরণ সহজলভ্য নয়, এবং ইহা যে-কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। আবার, Hand grenade আধুনিক বৃহৎ ট্যাঙ্কগুলির ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু পেট্রলের বোতল সেখানেও আগুন লাগাইতে পারে। আর একটি কথা, বাগচি মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাত-বোমা অথবা পেট্রলের বোতল ছুঁড়িয়া মারিতে হইলে ট্যাঙ্কের যত নিকটে যাওয়া প্রয়োজন, তত নিকটে অসহায় গরিলাবাহিনী কিরূপে যাইতে পারে? ইহার উত্তর মিত্র মহাশয় দিয়াছেন, তবে গত যুদ্ধের উদাহরণ আমাদের দরকার হইবে না। গত ইতালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময়েই হাবসীরা কেবল তরবারী এবং রাইফেল হস্তে ইতালীর ট্যাঙ্কের উপর লাফাইয়া উঠিয়া, ট্যাঙ্কে যে সকল ফাঁক আছে (বাহিরে দেখিবার) তাহার ভিতর দিয়া খোঁচাইয়া ভিতরের লোক-গুলিকে মারিয়া অনেক ট্যাঙ্ক ধৃত করিয়াছিল। অবশেষে

ইহা বলিতে চাই, যদি বাগচি মহাশয় মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধটি ভালো করিয়া পড়েন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, কোথাও এমন কথা উল্লেখ করা হয় নাই যে, পেট্রলপূর্ণ বোতল কামান বা বোমা অপেক্ষা বহু গুণ শক্তিশালী এবং উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী অংশটিতেও কোথাও তাহা বলা হয় নাই।

সমাপ্ত